পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দক্ষিণ এশিয়া স্টাডিজের আড়ালে অ্যান্টিইন্ডিয়া ল্যাবরেটরিগুলি বন্ধ হোক
— পৃঃ ১১

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

ঈশ্বরের মুখোশ, শয়তানের মুখ
—পৃঃ ১৩

৭০ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা।। ৩০ জুলাই ২০১৮।। ১৩ শ্রাবণ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

সেবার আড়ালে শিশুব্যবসা

মিশনারি অফ চ্যারিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা, ১৩ শ্রাবণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

৩০ জুলাই - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

অনাস্থা প্রস্তাব কেন? বোঝা গেল না ▯ গূঢ়পুরুষ **▯ ৬**

অসমীয়রা নিজেদের বাঁচাতে পারবেন তো?
▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা **▯ ৭**

বৃদ্ধি সবসময়ই শুভ ▯ গুরুচরণ দাস **▯ ৮**

পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দক্ষিণ এশিয়া স্টাডিজের আড়ালে অ্যান্টিইণ্ডিয়া ল্যাবরেটরিগুলি বন্ধ হোক
▯ সাধন কুমার পাল **▯ ১১**

ঈশ্বরের মুখোশ, শয়তানের মুখ ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত **▯ ১৩**

শ্রীমতী টেরিজার কাণ্ডকারখানা ▯ অমলেশ মিশ্র **▯ ১৫**

ভারতে খ্রিস্টিয়ান ধর্মপ্রচারের নামে নীতিহীন দুষ্কর্ম আর 'মাদার' টেরিজা ▯ অচিন্ত্য বিশ্বাস **▯ ১৭**

এই সিনেমা সমাজের মঙ্গলের জন্য নয়
▯ লকেট চ্যাটার্জি **▯ ২৩**

সঞ্জয় জাতে উঠলেন, রণবীরেরও হিল্লে হলো
▯ অনন্যা চক্রবর্তী **▯ ২৪**

শিবের পাঁচালী ▯ প্রণব দত্ত মজুমদার **▯ ২৬**

মহাভারতের চরিত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার **▯ ৩১**

পৌরাণিক কিরাত দেশ ▯ গোপাল চক্রবর্তী **▯ ৩৩**

গল্প : গেরুয়া আলোর পথ ▯ নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় **▯ ৩৫**

অভিন্ন দেওয়ানি বিধিই লাভ জেহাদের মতো কৌশলগুলিকে রুখতে পারে ▯ মাধবী মুখোপাধ্যায় **▯ ৪৩**

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ২০-২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ এইসময়, সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ অঙ্গনা : ৪০ ▯ খেলা : ৪১▯ অন্যরকম : ৪২ ▯ রঙ্গম : ৪৫ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
৬ আগস্ট, '১৮

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

গণপিটুনি

প্রকাশিত হবে
৬ আগস্ট '১৮

প্রমাণ করতে না পারলেও ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা অভিযোগ করতে ছাড়েন না। সানাইয়ের পোঁ ধরার মতো তাদের যোগ্য সঙ্গত করে মিডিয়া। মোদী সরকারের প্রশ্রয়েই নাকি দেশে অসহিষ্ণুতা এখন বেড়ে গেছে। হিন্দুত্ববাদী গুন্ডাদের হাতে নাকি যখন তখন মার খাচ্ছেন মুসলমান এবং জানজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। এই অভিযোগ কতদূর সত্য? আগামী সংখ্যায় স্বস্তিকা খুঁজবে এই প্রশ্নের উত্তর। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

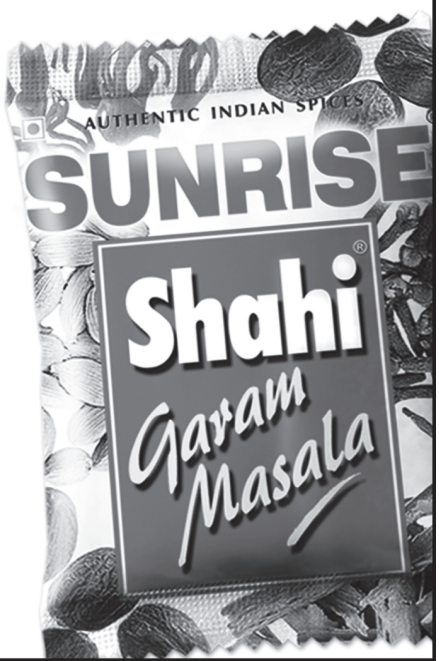

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আস্থা অটুট

দেশবাসীর বিপুল আস্থা ও ভরসায় সওয়ার হইয়া নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে দেশের সরকারে আসীন হইয়াছিলেন। ইহার চারি বৎসর পরে দেশবাসীর দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দেখাইলেন মোদী সরকারের ওপর সেই আস্থা অটুট রহিয়াছে। বিগত দিনগুলিতে ভারতবর্ষে ক্ষমতাসীন দলের সরকারের পতন চাহিয়া বিরোধী দলগুলি যতবারই অনাস্থা ভোটে গিয়াছে, এক-আধটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাহারা যে বিফলকাম হইয়াছে ইহাও সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও আস্থা ভোটে নরেন্দ্র মোদী সরকারের এই বিপুল জয় তাঁহার বিগত লোকসভা-নির্বাচনী সাফল্য অপেক্ষা কম কিছু নহে। প্রধানমন্ত্রীর বিপুল জনপ্রিয়তা দেখিয়া, তাঁহার রাজনৈতিক সততা ও ব্যক্তি সারল্যের সহিত আঁটিয়া উঠিতে ব্যর্থ হইয়া বিরোধী দলগুলি ও তাহাদের তাঁবেদার সংবাদমাধ্যমগুলি মোদীকে অপদস্থ করিতে যে হীন-কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল তাহা মুখ থুবড়াইয়া পড়ায় ভারতমাতা নিশ্চিন্তে এখন স্বস্তির শ্বাস ফেলিবেন।

গণতান্ত্রিক কাঠামোয় অনাস্থা প্রস্তাব বিরোধী দলের ন্যায্য অধিকারের মধ্যেই পড়িয়া থাকে এবং তাহাতে দোষাবহ কিছু নাই। কিন্তু একের পর এক নির্বাচনী সাফল্য যে শাসক দলের কপালে জুটিয়া থাকে, উপনির্বাচনে সেই সাফল্যের হার কিছু কম হইলে তাহা লইয়া গেল গেল রব তুলিয়া আঞ্চলিক স্বার্থে দেশের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিবার প্রয়াস যে গণতন্ত্রে কাম্য নহে, এই কথাটি এদেশের বিরোধী দলের বুঝিবার সময় আসিয়াছে। সমস্যা বাধিয়াছে, নরেন্দ্র মোদীর দলের বিপুল জনপ্রিয়তা বর্তমান ভারতবর্ষে কোনও 'বিরোধী' দল অর্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়াও অনেকে আজও প্রধানমন্ত্রিত্বের স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্ন বিলাসীরা আজ একজোট হইয়াছেন, দেশের স্বার্থকে তুচ্ছ করিয়া ব্যক্তি-ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার বাসনায় তাঁহারা যে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সম্মানকে পদপিষ্ট করিতেছেন, ইহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। নচেৎ যে মোদী সরকারের উপর দেশের জনগণ, জনপ্রতিনিধিদের আস্থাচ্যুত হইবার ন্যূনতম প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তাহার শরিক ভাঙাইয়া, তাহার সাংসদদের বিক্ষুব্ধ করিয়া এক হীন ষড়যন্ত্র চরিতার্থ করিবার এহেন প্রয়াস কেন?

একদা শরিক তেলুগু দেশম পার্টি অনাস্থা আনিবার পরে সোনিয়া গান্ধী বলিয়াছিলেন—'কে বলিয়াছে সরকার ফেলিবার সংখ্যা আমাদের নাই?' তাঁহারা বোধহয় আশা করিয়াছিলেন, ক্ষমতাসীন শরিক ও শাসকপক্ষের দলবল ভাঙিয়া ভারতের স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করিবেন। তাঁহাদের এই স্বার্থসিদ্ধি যে হয় নাই ইহা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্রের পক্ষে পরম মঙ্গল। কিন্তু আমাদের হতবাক করিয়াছে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর আচরণ। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অকস্মাৎ জাপটাইয়া ধরিয়া বিশ্বপ্রেমের বাণী শুনাইলেন, নিজ ঔদার্য্য প্রমাণের চেষ্টা করিলেন, আবার পরক্ষণেই অশালীন মুখ-ভঙ্গিমা, চক্ষের লজ্জাহীন ইশারায় গোটা সংসদকে জানান দিলেন তাঁহার ওই আলিঙ্গন নাটক ব্যতীত আর কিছু নহে। আরও দুর্ভাগ্য, এক বিরোধী নেতার এই নির্লজ্জ অশালীনতায় যখন গোটা দেশবাসী স্তম্ভিত, নিন্দার ভাষা হারাইয়াছেন তখন তাহার এই আচরণকে গৌরবান্বিত করিতে এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমও লজ্জার মাথা খাইয়া সচেষ্ট হইয়াছেন। ইঁহাকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করিতে দেশবাসীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত একদল রাজনীতিক স্বপ্ন দেখিতে পারেন, কিন্তু ধরণী দ্বিধা হইবার সুযোগ পাইবেন এমন সম্ভাবনা দুঃস্বপ্নেও আসে নাই।

সামগ্রিকভাবে এই অনাস্থা প্রস্তাব পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের শাঁখ বাজাইয়া দিয়াছে। বিজেপি যে চালকের আসনেই বসিয়া আছে তাহা আরও একবার প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

সুভাষিতম্

দূরস্থানে চ মিত্রাণি নিস্নেহাশ্চৈব বান্ধবাঃ।
প্রয়োজনং কিংকর্তব্যমর্থতো নিষ্প্রয়োজনম্।। ১৮৯।।

দূরস্থিত মিত্র এবং স্নেহশূন্য বন্ধু কি বা প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে? বস্তুত তাদের দিয়ে কোনও কাজই সাধিত হতে পারে না।

অনাস্থা প্রস্তাব কেন? বোঝা গেল না

একটা কথা বোঝা গেল না। পার্লামেন্টে বিজেপি বিরোধীরা হঠাৎ কেন অনাস্থা প্রস্তাব এনে নিজেদের উলঙ্গ করে দেখালেন তাদের মধ্যে ঐক্য নেই। দিশাহীন কিছু নেতা আবোল-তাবোল কথা বলে প্রমাণ করলেন খবরের কাগজের বাইরে তারা আর কিছু পড়েন না। অনাস্থা প্রস্তাব অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বক্তাদের রীতিমত তৈরি হয়ে আসতে হয়। যদি দুর্নীতিকে অস্ত্র করে সরকারকে আক্রমণ করতে হয়, তবে প্রামাণ্য তথ্য দিতে হবে। সংসদ শুধুই গলাবাজি করার জায়গা নয়। বিরোধী দলের নেতা কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখন আর দেশের পাহারাদার নন, তিনি ব্যবসায়ীদের ঘুষের টাকার ভাগীদার। কারণ, ফ্রান্স থেকে যুদ্ধ বিমান কেনার চুক্তি হয় কংগ্রেসের ইউ পি এ সরকারের আমলে। বিমান পিছু দাম স্থির হয় ৫২০ কোটি টাকা। সেই একই বিমান একই সংস্থার কাছ থেকে বিজেপির এনডিএ সরকার কিনেছে ১৬০০ কোটি টাকায়। মোদী ঘনিষ্ঠ দুটি ব্যবসায়ী সংস্থা কাটমানি খেয়েছে ৪৫,০০০ কোটি টাকা। গুরুতর অভিযোগ। কিন্তু অভিযোগ করলেই হবে না। প্রমাণ করতে হবে। ইউ পি এ সরকারের আমলে রাফায়েল বিমান চুক্তির প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। কত দামে তখন এক একটি বিমান ভারত কিনেছে তার প্রমাণ দিতে হবে। এখন বর্তমান সরকার কী দরে ফ্রান্স থেকে বিমান কিনেছে বা কিনছে তার নির্দিষ্ট প্রমাণপত্র সংসদে পেশ করতে হবে। রাহুল গান্ধী কিছুই করলেন না। বললেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাকরঁ তাঁকে বলেছেন। ভালো কথা। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট তাঁকে কবে, কোথায় বলেছেন? বিশ্বকাপ ফুটবল দেখতে দেখতে? তা তো নয়। রাহুল গান্ধী ফ্রান্সের ফুটবল দেখতে রাশিয়ায় উপস্থিত ছিলেন এমন তথ্য জানা নেই। ছদ্মবেশ ধারণ করে মাকরঁর সঙ্গে গোপনে দেখা করেছিলেন এমন তথ্যও জানা নেই। তবে ফরাসি প্রেসিডেন্টের দপ্তর সরকারি বিবৃতি দিয়ে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিক্রির বিষয়টি অতি গোপনীয়। একমাত্র দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের মনোনীত প্রতিনিধিরা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ বিষয়টি জানতে পারে না। এই কারণে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং সুইডেনের বোফর্স কামান কেনার দুর্নীতি নিয়ে রাহুলের বাবা রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

গূঢ় পুরুষের কলম

করেছিলেন। তখন ঘুষের তথ্য প্রমাণিত হয়নি। গোপনীয়তা রক্ষায় সুইডিস সরকার চুক্তিবদ্ধ ছিল। আজ রাহুল গান্ধী ভিত্তিহীন প্রমাণহীন দুর্নীতির অভিযোগ করছেন প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রহননের জন্য। হ্যাঁ, ঠিক একই কাজ অতীতে বিশ্বনাথ প্রতাপ ও তাঁর প্রাণের দোসর মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা করেছিল রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে। মানুষের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে। বিশেষ করে যেখানে অভিযোগ প্রমাণের দায় নেই। দায়িত্ব নেই।

সংসদের ফ্লোরে রক্ষা কবচের আড়ালে সাংসদরা এমন অনেক কথা বলতে পারেন, যা বাইরে বলা যায় না। সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের সুযোগে রাহুল গান্ধী যেসব কথা বলেছেন তা মানহানিকর। আদালতে মামলা করা যেতে পারে। কিন্তু সংসদীয় রক্ষা কবচ থাকায় মামলা করা যাচ্ছে না। মোদীজী ঠিকই বলেছেন, 'এমনই বাচ্চাদের মতো রাফাল বিমান চুক্তি নিয়ে কথা বলা হলো যে দুই দেশকে বিবৃতি দিতে হল। অথচ এতে কোথাও দুর্নীতি ছিল না।' কিন্তু শিশুর (রাহুল) কথায় কি বিবৃতি দিতে হয়? সে প্রশ্নও উঠেছে কোথাও কোথাও। যে কথাটা মোদীজী বলেননি, তা হচ্ছে এই শিশুসুলভ আচরণের জন্যই দেশের মানুষ রাহুলকে 'পাপ্পু' বলে। কেউ পাপ্পুকে গুরুত্ব দেয় না। প্রধানমন্ত্রী পদের একটা গুরুত্ব আছে। এই গুরত্বটা জানতে হবে। এর জন্য দেশের সংবিধান, সংসদীয় আচরণ কীভাবে মেনে চলতে হয় জানতে হবে। এতটা অপরিণত যুবকের হাতে বিরোধী দলের নেতৃত্ব তুলে দিলে আদতে সর্বনাশ হবে দেশের মানুষের।

সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব আনাটা অপরাধ নয়। কিন্তু কেন এই প্রস্তাব আনা হচ্ছে সেটা স্পষ্ট করে জানাতে হবে বিরোধীদের। রাফাল বিমান চুক্তিতে দুর্নীতির জন্য অনাস্থা আনা হয়েছে তেমন নয়। তবে কি দেশে মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ বলে অনাস্থা? অথবা রাহুল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী ধনী ব্যবসায়ীদের পকেট ভারি করে গরিবদের দুর্দশা জারি রেখেছেন, সেই কারণে অনাস্থা। সবিনয়ে স্বীকার করছি যে, সত্যি আমি জানি না, 'অনাস্থা' আনা হল কেন? লালুপ্রসাদ যাদবের ছেলে তেজস্বী যাদব অবশ্য বলেছেন, 'অনাস্থা প্রস্তাব সব সময় সরকার ফেলার জন্য হয় না। জনগণের সামনে সরকারকে জবাবদিহি করানোর জন্য আনা হয়।' এখানেই আমার আপত্তি। প্রধানমন্ত্রীকে কী জবাবদিহি করতে হবে? সেটাই বুঝতে পারছি না। কংগ্রেস সভাপতি সার্জিক্যাল স্ট্রাইককে জুমলা স্ট্রাইক বলেছেন। এতে পাকিস্তান সরকার এবং জঙ্গিরা খুশি হতে পারে। কিন্তু ভারতীয় সেনা জওয়ানরা নয়। প্রাণ দিয়ে যাঁরা দেশের সীমান্ত রক্ষা করছেন তাঁদের অপমান করার অধিকার পাপ্পুদের দিল কে? আমাদের রাজ্যের তৃণমূল সাংসদরা একটাই বাংলা কথা জানেন। মাফিয়া, সিণ্ডিকেট, তোলাবাজি। অনাস্থা প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে গিয়ে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেছেন, মোদী সিণ্ডিকেট তৈরি করে দেশ লুঠছেন। যে লোক নারদ কেলেঙ্কারিতে জড়িত তার মুখে লুঠের কথা মানায় না। এদের কাছে মোদীজীকে জবাবদিহি করতে হবে? ■

অসমীয়রা ভবিষ্যতে নিজেদের বাঁচাতে পারবেন তো?

মণীন্দ্রনাথ সাহা

গত মে মাসে গুয়াহাটিতে এন আর সি নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির বহু প্রতীক্ষিত শুনানি শুরু হতেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। সেখানে প্রফুল্ল কুমার মহন্ত, অখিল গগৈ, বামনেতা হীরেন গোঁহাই ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের নেতা যেমন— কেশব মহন্ত, রিপুন বরা, তরুণ গগৈ, দেবব্রত শাইকিয়া, রক্তিবুল হুসেন, আবু ফলেহ নিজামুদ্দিন প্রমুখ প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। এছাড়া বুদ্ধিজীবী ড. হীরেন গোঁহাই, হরেকৃষ্ণ ডেকা, মনজিৎ মহন্ত সকলেই একবাক্যে উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙালির নাগরিকত্বের বিরোধিতা করেন। সেখানে ভীষণভাবে আওয়াজ উঠেছে 'হিন্দু বাংলাদেশি হুঁশিয়ার'।

১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে কেন্দ্র সরকার যখন ধর্মীয় নিপীড়নের ফলে বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে, তখন অসমের প্রতিবাদকারীরা দাবি তুলেছে— 'অসম চুক্তি মেনে বিদেশিদের বহিষ্কার করতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে বিদেশিদের বিভাজন করা যাবে না। ১৯৭১ সাল অবধি বিদেশির বোঝা বইছে অসম, আর বোঝা নেবে না ইত্যাদি। তবে মজার কথা, অসমীয় নেতারা 'হিন্দু বাংলাদেশি হুঁশিয়ার' ধ্বনি দিলেও বাংলাদেশি মুসলমানদের হুঁশিয়ারি দেননি। বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালিদের নাগরিকত্ব দিলে অসমের ক্ষতি হবে আর বাংলাদেশি মুসলমানরা অসমে থেকে গেলে অসমের উন্নয়নের জোয়ার ছুটে চলবে? অসমীয়রা হয়তো ভুলে গেছেন যে ইতিপূর্বে বাঙালি হিন্দুরা দু'বার অসমকে বাঁচিয়েছে। বাঙালি হিন্দুদের অসম থেকে তাড়ালে মুসলমানদের হাত থেকে অসমকে রক্ষা করতে পারবেন তো? অসমীয়দের অস্তিত্ব বজায় থাকবে তো?

বাঙালিরা কীভাবে অসমকে দু'বার বাঁচিয়েছে সেটা জানা যাক। প্রথমবার ১৯০৫ সালে কার্জনের উদ্যোগে বাংলা ভাগ করা হয়। এর কারণ ছিল বাঙালি হিন্দুদের উভয় বাংলায় সংখ্যালঘুতে পরিণত করে তাদের শাসনক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সৃষ্টি করে ব্রিটিশের রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণ করা। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালি হিন্দুদের প্রচণ্ড সংগ্রামে বাংলা ভাগ রদ হলো। বাঙালি হিন্দু যুবকদের আত্মবলিদানে অসম শুধু মুসলমান প্লাবন থেকে রক্ষা পেল না; তার আলাদা সত্তা ও মর্যাদা স্থাপিত হলো।

দ্বিতীয়বার, ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দৌলতে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় এল। রাজনীতি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে রইল— অসমীয় হিন্দু, বাঙালি হিন্দু এবং মুসলমান। অসমীয় মুখ্যমন্ত্রী হলেও শাসনক্ষেত্রে লাঠি ঘোরাত শ্রীহট্টের বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নেতারা। তখন থেকেই শুরু হলো 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন এবং বাংলাভাষী শ্রীহট্ট জেলার অসম চুক্তিতে তীব্র ক্ষোভ।

অসমকে অকারণে বাংলার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে অসমীয়দের বাঙালি মুসলমানদের পদপিষ্ট হবার বিরুদ্ধে বাঙালি কংগ্রেস নেতারা নেহরুর কাছে দরবার করেছিলেন। কিন্তু বাংলার কংগ্রেস নেতাদের অসমের পক্ষে ওকালতি শুনে নেহরু ধৈর্য হারিয়ে বলছেন— 'অসমের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে সারা ভারতের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না'। "Pandit Nehru gave curt reply (to the members from Bengal) saying that Assam could not hold up the progress of the rest of India and suppott to Assam would mean refusal to accept the British Prime Minister's statement of December and lating loose forces of caous and civil war." (Transfer of Power) কিন্তু এ ব্যাপারে গান্ধীজী ছিলেন অনড়। তিনি অসমীয় নেতাদের কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের নির্দেশের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ করতে নির্দেশ দিলেন— "I (Gandhiji) told Mr. Bardalui that if there is no clear guidance from the congress working Committee, Assam should not go into a section. If should loss its protest and retire from the Coustituent Assembly." (Transfer of Power)

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত গ্রুপিং ব্যবস্থার ব্যর্থতা, দেশভাগের সিদ্ধান্ত এবং বাঙালি হিন্দুর বাংলাভাগের দাবি এবং সে দাবির স্বীকৃতি অসমকে পাকিস্তানের কবল থেকে রক্ষা করে। বাঙালি নিজে আত্মঘাতী হয়েও অসমকে বাঁচিয়ে দিল। অসমীয় নেতারা কীভাবে শ্রীহট্ট জেলার হিন্দুদের বঞ্চনা করল এবং তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল, তারও লিখিত বিবরণ রয়েছে। মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনাকালে অসমের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলুই খোলাখুলিই বলেছিলেন, শ্রীহট্ট জেলাকে অসম থেকে ছেঁটে পাকিস্তানে দিয়ে দিলে অসমের কোনও ক্ষতি নেই—

"He (Bardalui) told me that Assam would make no difficulties about the Partition of Sylhet. Since the general views was that they belonged to Bengal and would be no loss to the rest of province. The only people who might kich up a fass would be the 40 percent non-muslism minority in the Sdylhet District."

একবার বরদলুই ভুল করে শ্রীহট্ট জেলাকে ছেঁটে ফেলে অসমের যে ক্ষতি করেছেন, সেইরূপ বর্তমান অসমীয় নেতারা আবার ভুল করে যেন অসমীয়দের বিপদ ডেকে না আনেন। অসম থেকে বাঙালি হিন্দুদের তাড়িয়ে অসম বাঁচাতে পারবেন বলে মনে করলেও বিদেশি উচ্চ ফলনশীল সম্প্রদায়ের হাত থেকে ভবিষ্যতে নিজেদের বাঁচাতে পারবেন তো? ভেবে দেখবেন। ■

বৃদ্ধি সব সময়ই শুভ

অতিথি কলম

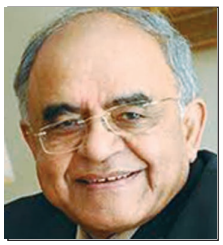

গুরুচরণ দাস

মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মণ্যম তাঁর বিদায়ের প্রাক্কালে আমাদের অভিধানে একটি নতুন বাগ্‌ধারা যোগ করে গেলেন— 'stigmatised capitalism' অর্থাৎ কলঙ্কিত পুঁজিবাদ। এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে পুঁজি সেই অর্থে ভারতে এখনও আরাধ্য নয়, কেননা এই মুক্ত বাজার অর্থনীতির পরিমণ্ডলেও পুঁজি ভারতে স্বাচ্ছন্দ্যে কারবার করার সাহস দেখাতে পারল না। সমস্যাটা কিন্তু আরও গভীরে। ২০০৮ সালের মার্কিন দেশ থেকে উদ্ভূত বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভবের পর পাশ্চাত্যের নাগরিকদের মতো ভারতীয়রাও অতীতে যা কখনও করেনি সেই অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিয়ে সদাই প্রশ্ন তুলছে।

দেখে শুনে মনে হয় অর্থনীতির প্রাথমিক পাঠ নেওয়ার সময় যা শেখানো হয় সেই আপ্তবাক্য ''কেবলমাত্র ক্রমাগত অর্থনৈতিক উচ্চ হারে বৃদ্ধির মাধ্যমেই একটি গরিব দেশ ক্রমে ধনী হয়ে উঠতে পারে।'' হ্যাঁ, এটি আমরা বিস্মৃত হয়েছি। যখন কারুর বাৎসরিক আয় বছরে ৪০ হাজার ডলার দাঁড়াবে তখন তার অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ব্যাপারে সন্দিহান হওয়ার জায়গা আছে। কিন্তু যখন বাৎসরিক আয় ২ হাজার ডলারও ছুঁতে পারছে না তখন এ প্রশ্ন অবান্তর। ইউপিএ দুই সরকার পড়ে যাওয়ার অন্যতম মূল কারণ ক্রমিক জিডিপি বৃদ্ধির দিক থেকে নজর সরিয়ে তার বদলে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে মন দেওয়া। নরেন্দ্র মোদীও একনিষ্ঠভাবে আক্ষরিক অর্থে পাশবিক হারে অর্থনৈতিক ও চাকরি ক্ষেত্রের বৃদ্ধির দিকে সেইভাবে গুরুত্ব ধরে না রাখায় 'অচ্ছে দিনে'র দেখা হয়তো তেমন নজরে এল না। মনে পড়ে, ২০১০ সালের গোড়ার দিকে ঠিক তার আগের শেষ ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের জিডিপি বৃদ্ধি ১০ শতাংশ দাঁড়িয়ে যায়। এরই উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এক টিভি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলাম। প্রসঙ্গত সেই সময় জিডিপি বৃদ্ধি সমস্ত রেকর্ড ভেঙে প্রায় দশ বছর ধরে লাগাতার ৮ শতাংশের ওপর চলছিল। এই সূত্রে আমি বলেছিলাম যে ১৯৯১ সালে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংস্কারগুলির সুফল শেষাবধি দেশ পেতে শুরু করেছে। এইভাবে আরও দু'টি দশক বৃদ্ধি ধরে রাখতে পারলে ভারত অবশ্যই একটি সম্মাননীয় মধ্যবিত্তের দেশ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু আলোচনা চক্রের অন্য সদস্যেরা এই নিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

একজন বললেন এটা চাকরিহীন বৃদ্ধি (jobless growth)। অন্যজন সকল শ্রেণীকে সঙ্গী করে (inclusive growth) বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমাকে শিক্ষিত করে তুলতে চাইলেন। আমি একই সঙ্গে দুঃখিত হলাম, কিছুটা মজাও পেলাম। বিশ্বের যে কোনও দেশ বছরের পর বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই ধরনের বৃদ্ধি ধরে রাখার প্রচেষ্টায় নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে পারে। সেখানে আমাদের দুই মহামান্য রাজনীতিবিদ তার জন্য হা-হুতাশ করছেন।

অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিয়ে এই সন্দিগ্ধতা চরমে উঠেছিল সোনিয়া গান্ধীর উপদেষ্টা মণ্ডলীর কার্যকলাপের সময়। এরই পরিণতিতে সরকার বৃদ্ধি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সরকার এন আর ই জি এ, খাদ্য নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিলিয়ে দেওয়ার কৌশল নিয়ে গরিবদের মন জয় করার চেষ্টায় মন দেয়। এরই প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে দেখা দেয় কুখ্যাত নীতি পঙ্গুতা'।

অবাক হওয়ার কোনও সুযোগ না দিয়ে বৃদ্ধির হার ২০১১ থেকে ডুবতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে নরেন্দ্র মোদীর 'বিকাশের' প্রতিশ্রুতি যা বাস্তবে উচ্চহারে বৃদ্ধি ও চাকরির বাজারের সম্প্রসারণেরই একটি কোড ওয়ার্ড বা সাঙ্কেতিক পরিভাষা মাত্র। সাত বছর (২০১১ ধরে) পেরিয়ে গেলেও আগের সেই গতিশীলতা অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিও তাই এখনও পর্যন্ত রক্ষিত হয়নি।

জিডিপি বৃদ্ধির হার নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা ধনী দেশগুলির ক্ষেত্রে শোভা পায়। সেখানে সাম্প্রতিক দশকে উন্নয়ন বা সুফল সমভাবে বণ্টিত হয়নি। এরই আংশিক প্রতিক্রিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ক্ষমতায় আনতে সাহায্য করে। কিন্তু ভারতের এর থেকে তেমন কিছু সতর্ক হওয়ার মত বিষয় নেই। উলটে পশ্চিমের ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলি কীভাবে ধনী হয়ে উঠল সেই নিদান জানার দরকার আছে।

> বাজার অর্থনীতির ফলে আয় বৈষম্য নিয়ে চুলচেরা বিচার না করে দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসারে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি। ভালো স্কুল ও হাসপাতাল তৈরি হওয়ার সঙ্গে জীবনযাত্রার মান ও স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়বে। অন্য কোনও দিকে নজর না ঘুরিয়ে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, চাকরির বাজার বাড়ানো ও বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যাওয়াই সমৃদ্ধির একমাত্র পথ।

মানুষের ইতিহাস বলে যে প্রতিটি দেশই এক সময় গরিব ছিল। ১৮০০ সালের কাছাকাছি শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর থেকেই বৃদ্ধির সম্ভাবনা শুরু হয়। প্রথম বছর থেকে অর্থাৎ ১ থেকে ১৮০০ সাল অবধি বিশ্বের বৃদ্ধি থমকেই দিল জন প্রতি ২০০ ডলারের নীচে। কিন্তু ২০০০ সাল আসতে না আসতেই তা দাঁড়ায় জন প্রতি ৬৫৩৯ ডলার। জীবনযাত্রার মানের এই ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কেবলমাত্র অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ফলেই। ভারতের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সময়ের ৭১ ডলারে পৌঁছন একইভাবে তুলনীয়। চীনের ক্ষেত্রে তা আরও নাটকীয়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডেভিড পিলিং তাঁর The Grouth Delassion গ্রন্থে বলছেন, ''তুমি যদি গরিব হও অর্থনীতির সামাজিক বৃদ্ধি তোমার অবস্থায় পরিবর্তন এনে দেবেই''। তাই, আমি বৃদ্ধি সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের বলতে চাই গড় জীবনযাত্রার মানে এই বিপুল পরিমাণ পরিবর্তন সাধিত হওয়াটা কি খুব খারাপ জিনিস?

হ্যাঁ, এই মতবাদেরও সীমাবদ্ধতা অবশ্যই আছে। জিডিপি-এর মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী বা অবস্থানের মানুষের সঠিক আয়ের প্রতিফলন পাওয়া যায় না। সরকারের দেওয়া পরিষেবা, বিশুদ্ধ বাতাস, প্রান্তিক চাষির আয় কিংবা অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্তরা (এর বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ) এদের ধরা হয় না। এর মধ্যে আমাদের ঘর-গৃহস্থালীতে যারা বৃদ্ধ বা শিশুর পরিচর্যা করেন মূলত সেই সব মহিলাদের কোনও হিসেব থাকে না।

বাস্তবে অর্থনীতি দ্রুতগতিতে বেড়ে চললেও যদি দেশের মধ্যে একটা বিরাট অংশ এই বৃদ্ধি থেকে কোনও উপকার না পায় সেক্ষেত্রে প্রশ্ন করার অবকাশ অবশ্যই আছে যে জিডিপি বৃদ্ধি তবে কিসের জন্য? কিন্তু একটি গরিব দেশের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। গরিব দেশের মানুষের ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে অতিকায় বৃদ্ধি তার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে আসে। একই সঙ্গে বামপন্থীদের করা ভবিষ্যদ্‌বাণী 'বাজারের শক্তি গরিবকে শ্রমজীবীকে নিঃসম্বল অর্থে ভিখিরি করে দেবে'--- এই তথ্যও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়।

বৃদ্ধি সম্পর্কে সন্দিহানশ্রেণী সর্বদা জাপানের উদাহরণ দিতে ভালোবাসেন। জাপানে বৃদ্ধি ২৫ বছর ধরে এক জায়গায় আটকে ছিল। কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রার মান কেবলমাত্র বাজারদরের ওঠানামার ওপর নির্ভর করে স্থিত থেকেছে। কিন্তু ১৯৯০ থেকে ২০০৭ সালের সময়সীমায় জাপানের মাথাপিছু জিডিপি শতকরা ২০ শতাংশ বেড়েছে। আসলে সমস্যাটা রয়ে গেছে অন্য জায়গায়। কেবলমাত্র সাধারণভাবে জিডিপি কী হারে বাড়ল না ধরে মাথাপিছু গড়ে তার বৃদ্ধির যে হিসেব তাকে ধরতে হবে। এটি একটু জটিল প্রক্রিয়া।

আর একটা বিষয়ে আমি এ প্রসঙ্গে পরিবেশবিদদের সঙ্গে বিরোধিতা করব না। দেশের অভ্যন্তরে অকাতরে জলের অপচয়, মাত্রাহীন যানবাহনের মাধ্যমে ক্রমাগত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ বা কয়লাকে জ্বালানি হিসেবে নিশ্চিন্তে ব্যবহার করে চলা— এগুলি নিশ্চয় কাম্য নয়। আমাদের দেশে নদীগুলি ও বাতাসকে অবশ্যই নির্মল রাখতে হবে। কিন্তু এই পরিবেশ সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে আমরা যদি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির দিক থেকে ফোকাস সরিয়ে নিয়ে তাকে অগ্রাধিকারের মর্যাদা না দিই তার ফল হবে মারাত্মক। তত্ত্বগতভাবেও কিন্তু এটা প্রতিষ্ঠা করা যায় যে বিশাল অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে দেশে নির্মল বাতাবরণ রক্ষা করার কোনও বিরোধ নেই।

তাই, সমস্যাটা সব সময় জিডিপি-কে নিয়ে নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, দেশের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা জিডিপি-কে কীভাবে ব্যবহার করছি। উদাহরণ স্বরূপ জিডিপি বৃদ্ধিকে মানব সংসাধন ক্ষেত্রের অগ্রগতি, নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সঠিক খবরাখবর যাচাই করে সেগুলিকে জিডিপি-র সঙ্গে মিশিয়ে ধরি তাহলে দেশবাসীর পক্ষে এই হিসেব কতটা হিতকারী তার আন্দাজ পাওয়া যাবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাজার অর্থনীতির ফলে আয় বৈষম্য নিয়ে চুলচেরা বিচার না করে দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসারে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি। তাহলেই ভালো স্কুল ও হাসপাতাল তৈরি হওয়ার সঙ্গে জীবনযাত্রার মান ও স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়বে। অন্য কোনও দিকে নজর না ঘুরিয়ে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, চাকরির বাজার বাড়ানো ও বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যাওয়াই সমৃদ্ধির একমাত্র পথ।

(লেখক বিশিষ্ট ভাষ্যকার)

রম্যরচনা

তিন দেশের তিনজন মানুষ নিজেদের ভিতর আলোচনা করছে। প্রথমজন আমেরিকান। সে বলল— জানিস, আমাদের দেশে এমন একজন মানুষ আছে যার শরীরে হার্ট বলে কিছুই নেই। তবু সে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয়জন রাশিয়ান। সে বলল— এ আর এমন কী। আমাদের দেশে এমন একজন মানুষ আছে যার ব্রেন নেই। তবু সে দিব্যি আছে।

তৃতীয়জন ভারতীয়। সে এই দুজনের কথা শুনে মুচকি হেসে বলল— আমাদের দেশে এমন একজন আছে, যার হার্ট নেই, ব্রেনও নেই। তবু তাকে আমরা একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করে দিয়েছি।

* * *

একটি বাচ্চা ছেলে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করছে— বাবা, আমার মেসো তোমার কে হয়?

বাবা— যে দোকান থেকে জিনিস কিনে আমি ঠকেছিলাম, সেই একই দোকান থেকে আর যিনি জিনিস কিনে ঠকেছেন— তিনিই তোমার মেসো।

* * *

স্ত্রী— শোন, মৃত্যুর পরেও যেন আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি। স্বর্গেও যেন আমাদের দুজনের দেখা হয়।

শুনেই স্বামী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। বলল— ওগো, একথা আর কখনো বোল না।

স্ত্রী— কেন, তুমি কি শুনে খুব কষ্ট পেলে?

স্বামী— না। আমি আঁতকে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম, মরেও কি তাহলে আমার রেহাই নেই।

উবাচ

"প্রত্যেকটা অপরাধের ঘটনা নিয়ে রাহুল গান্ধীর হৈচৈ বন্ধ করা দরকার। যথেষ্ট হয়েছে। আপনি ঘৃণার সওদাগর।"

আলওয়ারে আরবককে গণপিটুনির প্রসঙ্গে

পীযূষ গোয়েল
কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী

"প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং গণপ্রহারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা যতই বাড়বে, ততই এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হতে থাকবে।"

অলওয়ারে গণপ্রহারে মৃত্যুর প্রসঙ্গে

অর্জুনরাম মেঘওয়াল
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

"রাহুল গান্ধী সংসদে প্রধানমন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কিন্তু ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে দেশের মানুষ রাহুল গান্ধীকে আলিঙ্গন করবেন না।"

সংসদে প্রধানমন্ত্রীকে রাহুল গান্ধীর আলিঙ্গন প্রসঙ্গে

অনিল বালুনি
বিজেপির জাতীয় প্রচার মাধ্যমের দায়িত্বপ্রাপ্ত

"আমেরিকাকে ভয় দেখালে এমন ফল ভুগতে হবে, যা ইতিহাসে কেউ কখনও দেখেনি।"

ইরানের রাষ্ট্রপতি হাসান রৌহানির বক্তব্যের জবাবে

ডোনাল্ড ট্রাম্প
মার্কিন রাষ্ট্রপতি

"কোহলিকে তাড়াতাড়ি প্যাভেলিয়নে ফেরাতে পারলেই ইংল্যান্ডের সিরিজ জয়ের কাজ সহজ হয়ে যাবে।"

আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ সম্বন্ধে

জেমস অ্যান্ডারসন
ব্রিটিশ জাতীয় ক্রিকেট দলের পেস বোলার

পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দক্ষিণ এশিয়া স্টাডিজের আড়ালে অ্যান্টিইন্ডিয়া ল্যাবরেটরিগুলি বন্ধ হোক

সাধন কুমার পাল

এপ্রিলের (২০১৮) দ্বিতীয় সপ্তাহে কমনওয়েলথ ভুক্ত রাষ্ট্রনায়কদের বৈঠক উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লন্ডন যাত্রার সময় সাউথ এশিয়া সলিডারিটি, আওয়াজ, ব্রিটেন ভিত্তিক বিভিন্ন শিখ সংগঠন, ব্রিটেনের ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টেস অ্যান্ড অ্যালামনি ইউনিয়ন (এন আই এস এ ইউ), ব্রিটেনের প্রাক্তন ও বর্তমান ভারতীয় ছাত্রছাত্রী এবং ১৯টি ভারতীয় ও ভারত-সম্পর্কিত সংগঠন মিলে জম্মুর আসিফা ধর্ষণ কাণ্ড ও গুজরাটের উন্নাও কাণ্ড নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেছিল। মার্কিন চিন্তাবিদ আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি-সহ দেশ বিদেশের ৬০০ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পত্র লিখেছেন। পত্র পাঠিয়েছেন ৪৯ জন আমলাও।

বিদেশ ভিত্তিক এই সমস্ত সংগঠনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দলিত, মাইনরিটি, সলিডারিটি, হিউম্যান রাইটস জাতীয় এমন শব্দ যা দেখলেই মনে হবে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর হয়ে লড়াই করার জন্যই এদের জন্ম। একটু বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হবে যে এদের প্রতিবাদ বা মানবতা প্রদর্শন একপেশে। নির্দোষ করসেবকদের পুড়িয়ে মারা সংক্রান্ত গোধরা কাণ্ড নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে ভারতের সেকুলার ব্রিগেড গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে যে ভাবে একপেশে অবস্থান নিয়ে তাণ্ডবে মেতে উঠেছিল, ঠিক একই রকম ভাবে বিশ্বের দরবারে ভারতের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দেওয়ার কর্মসূচিগুলিকে উৎসবে পরিণত করেছিল বিদেশ ভিত্তিক এই সমস্ত সংগঠনগুলি। গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভিসা নাকচ করে দেওয়ার মতো নানা সক্রিয়তা দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিধর দেশগুলি ইন্ধন জুগিয়ে ছিল কট্টর ভারত বিরোধী এই সমস্ত শক্তিকে।

বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে প্রতিদিনই কোনও ঘটনা ঘটছে। কিন্তু যে সমস্ত ঘটনায় এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ সেই সঙ্গে বিজেপি কিংবা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলিকে কাঠগড়ায় তোলা যাবে বেছে বেছে সেই সমস্ত ঘটনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই সেকুলার ব্রিগেড ও তাদের বিদেশি সাঙ্গোপাঙ্গোরা। সমাজবাদী পার্টি শাসিত উত্তরপ্রদেশের দাদরি হোক বা গুজরাটের উনা, রহিত ভেমুলার আত্মহত্যা হোক বা কংগ্রেস জামানায় কর্ণাটকের বাসিন্দা লেখক গৌরী লঙ্কেশ কিংবা কালবুর্গির হত্যা, সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় নিয়ে পরিকল্পিত দলিত বিক্ষোভ হোক বা ভীমা কোরেগাঁও-এর পরিকল্পিত দলিত বিক্ষোভ কিংবা ট্রেনের সিট নিয়ে ঝগড়ার জেরে জুনেইদের মৃত্যুর সঙ্গে নিষিদ্ধ মাংস জুড়ে দিয়ে ইস্যু তৈরি করা হোক— প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আঙুল উঠছে প্রধানমন্ত্রী এবং হিন্দু সমাজের দিকে। জম্মুর নাবালিকা আসিফার মতো আমাদের দেশের আরো অনেক হতভাগী আছে যাদের করুণ পরিণতি ভারত বিরোধী হিন্দু বিরোধী এই স্বঘোষিত মানবতাবাদীদের সংবেদনশীলতায় আঁচড় কাটতে পারেনি।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের সময় উত্তরপ্রদেশের দাদরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'অসহিষ্ণুতা' শিরোনামে যে কৃত্রিম ঝড় তোলা হয়েছিল তাতেও এই সমস্ত বিদেশ ভিত্তিক সংগঠন ও তাদের ভারতীয় সহযোগী জেএনইউ যাদবপুর মার্কা ব্রেকিং ইন্ডিয়া ব্রিগেডের অবদান অসামান্য। বুঝে হোক বা না বুঝে হোক সে সময় পুরস্কার ত্যাগের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। ব্রেকিং ইন্ডিয়া ব্রিগেডের দাবি বিহার বিধান সভা নির্বাচনে বিজেপিকে পরাজিত করার কৃতিত্ব ওদের। রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতো কর্ণাটকে নির্বাচনের ঠিক আগে জম্মুর কাঠোয়া ধর্ষণকাণ্ড নিয়ে সেই ব্রিগেড আবার মাঠে নেমেছিল।

২০১৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এক শ্রেণীর ছাত্র ও বহিরাগত মিলে ভারত বিরোধী স্লোগান দিয়েছিল। এই ঘটনা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠে ছিল দেশ জুড়ে। ২০০২ সালে পুনের ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে (এফ টি আই আই) ঘটে যাওয়া আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে যে ভারতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিকল্পিত ভাবে বিভিন্ন এনজিও বা ছাত্র সংগঠনের ছদ্মবেশে দেশদ্রোহিতার পাঠ দেওয়া হয়। ওই বছর স্বাধীনতা দিবসের দিন পতাকা উত্তোলন করে এফ টি আই আই-এর নির্দেশকের বিদেশ যাত্রার নির্ঘণ্ট ছিল। দিল্লিতে একটি বৈঠক সেরে বিমানে ওঠার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু দুপুরবেলা পুনে থেকে এমন একটি ফোন আসে যার জেরে বিদেশ যাত্রা বাতিল তো বটেই তাকে ওই সংস্থার পদ থেকে ইস্তফাও দিতে হয়। কারণ এই সংস্থার কিছু ছাত্র পতাকা উত্তোলন করে বেরিয়ে যাওয়ার পরই ওই পতাকা নীচে নামিয়ে ওখানে বসে মদ্যপান করে খালি বোতলগুলি পতাকার রশি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে। স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি নির্দেশককে জানালে তিনি জাতীয় পতাকার অবমাননার দায় নিয়ে বিদেশ যাত্রা বাতিল করেন ও সংস্থার নির্দেশকের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। দিল্লি ও পুনের ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। দেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরকম ঘটনা প্রায়শই ঘটছে।

একটু পর্যবেক্ষণ করলেই স্পষ্ট হবে যে, মানবতাকে সামনে রেখে এই ধরনের সিলেকটিভ আন্দোলন স্বাভাবিক তো নয়ই বরং গভীর পরিকল্পনার ফসল। প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় কারা কী লক্ষ্য নিয়ে দেশে বিদেশে মানবতার মোড়কে ভারত বিরোধী ক্রিয়াকলাপে যুক্ত হচ্ছে। এই ব্রেকিং ইন্ডিয়া ব্রিগেড ভারত বিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালানোর জন্য কোথা থেকে আর্থিক ও বৌদ্ধিক সাহায্য পাচ্ছে? কেনই বা ভারতের বাইরে ভারত সম্পর্কিত বিরাট সংখ্যক সংগঠন গড়ে উঠেছে? কোন জাদু মন্ত্রে পরস্পর সাপে নেউলে সম্পর্কের সমীকরণে আবদ্ধ হয়েও বিভিন্ন সংগঠনে এই প্রতিবাদী গ্যাং শামিল হয়ে এক রহস্যময় বোঝাপড়া করে এক সঙ্গে দিনের পর দিন কাজ করে যাচ্ছে।

এই গ্যাং-এ একদিকে রয়েছে ভারতকে খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে কর্মরত চার্চ সংগঠন, অন্যদিকে রয়েছে এই

দেশকে ইসলামের ছাতার তলায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে কর্মরত জেহাদি সংগঠন, সেই সঙ্গে রয়েছে এদের ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থানরত ধর্মকে আফিম মনে করা উগ্র বামপন্থী ও মাওবাদীরা। বিগত ১,৩০০ বছর ধরে বিভিন্ন মুসলমান দেশ ও বিগত একশো বছর ধরে যে সমস্ত দেশে বামপন্থী ভাবধারা বিস্তার হয়েছে তাদের সঙ্গেও পশ্চিমি দেশগুলির শত্রুতার সম্পর্কই রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ভারত বিরোধী ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে নিজের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা ভুলে এই সমস্ত দেশ এক মঞ্চে আসছে কেমন করে। চেনা যুক্তিতে এই সমস্ত প্রশ্নের কোনও যুক্তিসঙ্গত উত্তর নেই। গবেষক লেখক ডঃ রাজীব মালহোত্রা ও অরবিন্দন নীলকন্দনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল 'ব্রেকিং ইন্ডিয়া' পুস্তকে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অকাট্য যুক্তি ও দৃষ্টান্তের সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বিগত চার/পাঁচশত বছর ধরে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করেছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে অন্য কোনও দেশ দখল করতে হলে সরাসরি আক্রমণ করে সেই দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করাই ছিল মুখ্য উপায়। একবিংশ শতাব্দীতে নিশানায় থাকা দেশ থেকে যুবক-যুবতীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগের নামে ওদের তিন চার বছর ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের কোনও না কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া ওই দেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের একটি উপায়।

রাজীব মালহোত্রা ও অরবিন্দন নীলকন্দনের দাবি আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ইউরোপের অনেক দেশে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র সংস্থা আছে। এই দেশগুলি এই সমস্ত গতিবিধি চালানোর জন্য পৃথক ভাবে অর্থ বরাদ্দও করে থাকে। এছাড়াও ইউরোপের অনেক সামাজিক সংগঠন, মানবাধিকার সংস্থা, বহুজাতিক কোম্পানি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোনও নির্দিষ্ট বিভাগ, বিভিন্ন মিডিয়া হাউস তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী ধারাগুলিকে নৈতিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করে থাকে।

পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনারি সংগঠনগুলিও একই উদ্দেশ্যে এই সমস্ত দেশগুলিতে কর্মরত। বিগত দশ বছর ধরে চীনের মতো মহাশক্তিকেও বিভিন্ন পশ্চিমি দেশ ও মিশনারিরা নিশানা করে ক্রিয়াকলাপ শুরু করেছে। পশ্চিমি বহুজাতিক সংস্থাগুলি প্রত্যেক কারখানার সঙ্গে যে সমস্ত ভূমিগত চার্চ নির্মাণ করেছে, চীন এই সমস্ত চার্চ ধ্বংস করে দেওয়ার কর্মসূচী নিয়েছে। ফলে চীনে প্রত্যেক বছর বিভিন্ন প্রদেশে কম করে ৫০০টি করে চার্চ ভেঙে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হবে যে, পশ্চিমি মহাশক্তিগুলি ভারতে পাঠানোর জন্য ল্যাব মেড মাওবাদী ও জেহাদি তৈরি করে থাকে। পশ্চিমের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশিয়া স্টাডিজ নামে যে বিভাগ চালু আছে সেই বিভাগগুলি থেকেই এই ধরনের গতিবিধি পরিচালিত হয়। ভারতে আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতাকে এলোমেলো করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে যে সমস্ত প্রকাশ্য ও ভূমিগত সংগঠন কাজ করছে এগুলির সিংহভাগই পশ্চিমি শক্তির ইশারায় চলছে। আধিপত্য বিস্তার ছাড়াও এই মহাশক্তিগুলির আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে বিগত চার-পাঁচশত বছর ধরে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করে যে প্রাকৃতিক সম্পদ লুটের পরম্পরা শুরু করেছিল সেটি কায়েম রাখা।

বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলির বিস্তার নীতির অঙ্গ হিসেবে কোনও দেশকে বাগে আনার জন্য নরমে গরমে নানা রকম কূট কৌশল ছাড়াও মিত্রতার আড়ালে সংশ্লিষ্ট দেশকে তার শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার মতো ঘৃণ্য ক্রিয়াকলাপও চালানো হয়। ওই সমস্ত দেশের প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা ইস্যুতে বিদ্রোহের পরিবেশ তৈরি করার জন্য ল্যাব মেড বিদ্রোহীদের পাঠিয়ে নিজেদের আধিপত্য কায়েমের মতো ঘৃণ্য কাজকর্মও করা হয়। ভারতের মতো বিশাল দেশে প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির সাহায্য নেওয়ার জন্য এদের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত।

বামপন্থী ভাবধারায় পরিচালিত আমেরিকার ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ শুধু ভারতে নয় এশিয়ার অধিকাংশ দেশে কাজ করে থাকে। এই সংস্থা বিদেশ নীতি, মানবাধিকার, অর্থনীতি এবং ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিত বিষয়ক অধ্যয়নের উপর প্রাথমিকতা দিয়ে থাকে। এদের অধ্যয়নের বিষয় বৈচিত্র্য যাই হোক না কেন এদের মূল কাজ হলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সক্রিয় বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবর্গকে নৈতিক ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া। এই সমস্ত গোষ্ঠীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করা।

তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশে ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ-এর শাখা রয়েছে। 'ব্রেকিং ইন্ডিয়া' পুস্তকের গবেষক লেখকদের মতে ৬০/৭০ বছর আগে যে সমস্ত দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই সমস্ত দেশে জেহাদি ক্রিয়াকলাপের রূপরেখা আমেরিকাতেই তৈরি হয়। এই সমস্ত দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য নিত্য নতুন প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন হিন্দু সমাজের সাম্প্রদায়িক মানসিকতা, সরকারি বৈষম্যের জন্যই ভারতে মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়ছে এবং সেখান থেকেই জন্ম নিচ্ছে ইসলামিক সন্ত্রাস। ল্যাব মেড কিংবা পেইড লেখক বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে এই ধরনের বিকৃত অসত্য তথ্য অনেকদিন ধরেই ভারতীয় জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে। ভারতীয় সমাজকে বিখণ্ডিত করার জন্য নতুন নতুন পন্থা পদ্ধতি ও কমশৈলী উদ্ভাবন করা হয়। তার উদাহরণ আমেরিকায় অবস্থিত ইন্ডিয়ান মুসলমান কাউন্সিল (আই এম সি)। ইন্ডিয়ান মুসলমান কাউন্সিল ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষাকারী একটি অধ্যয়ন গোষ্ঠী। তালিবান সমর্থক হিসেবে পরিচিত আই এম সি ৯/১১-এর ঘটনার পরও নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেনি। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে দাবিয়ে রেখে বর্ণ হিন্দুরা ভারতে অন্যায় দখল কায়েম করে রেখেছে আই এম সি-র এই ধরনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভারত বিরোধী আমেরিকান পণ্ডিতরাও একমত।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যে দেশ জুড়ে ছড়ানো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জাল ছিঁড়তে শুরু করেছে তা সরকারের দেওয়া তথ্য থেকেই স্পষ্ট। রাজ্যসভায় সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে ২০১১ সাল থেকে ২০১৭ পর্যন্ত সরকার বিদেশি সাহায্য প্রাপ্ত ১৮৮৬৮টি এনজিও-র লাইসেন্স বাতিল করেছে। এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে বিভিন্ন এনজিওগুলির কাছে আসা ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে ১৫,২৯৯ কোটি টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ১৭,৭৭৩ কোটি টাকা বিদেশি অর্থ ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে কমে দাঁড়িয়েছে ৬,৪৯৯ কোটি টাকায়। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক স্তরেও ভারতকে এই বিষয়ে সক্রিয় হতে হবে।

ঈশ্বরের মুখোশ, শয়তানের মুখ

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

গুঞ্জনটা অনেকদিন ধরেই ছিল। শেষ পর্যন্ত সেই গুঞ্জনকে সত্য প্রমাণিত করলেন মাদার টেরিজা প্রতিষ্ঠিত মিশনারিজ অব চ্যারিটির রাঁচীর দুই সিস্টার। শিশু চুরি এবং পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন— যা চকচক করে তার সবটাই সোনা নয়। সেইসঙ্গে এও বুঝিয়ে দিয়েছেন, মাদার টেরিজা এবং তাঁর মিশনারিজ অব চ্যারিটি সম্পর্কে গত কয়েক দশক ধরে যেসব বিস্ফোরক অভিযোগ বিভিন্ন মহল থেকে উঠছে— তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বরং, সেইসব অভিযোগের সারবত্তা অনেকটাই আছে। ব্রিটিশ সাংবাদিক ক্রিস্টোফার হিচিনস মাদার টেরিজাকে নিয়ে তাঁর অন্তর্তদন্তমূলক গ্রন্থ 'দ্য মিশনারি পজিশন : মাদার টেরিজা ইন থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস'-এ টেরিজাকে একজন 'প্রতারক এবং মৌলবাদী' হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। বলতে গেলে হিচিনসই প্রথম সাংবাদিক যিনি মিশনারিজ অব চ্যারিটি নামের আড়ালে মাদার টেরিজার প্রতিষ্ঠানে কী ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ হয়ে থাকে তা বিশদে তুলে ধরেছেন। শিশু পাচার থেকে শুরু করে অনেক বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গেই যে এরা যুক্ত তা হিচিনস প্রমাণাদি-সহ পেশ করেছেন। হিচিনস ছাড়াও, মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক সার্জ লারিভ এবং জেনেভিয়েভ চেনার্ড ও অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারোল সেনেচাল— এঁরাও মাদার টেরিজা সম্পর্কে অন্তর্তদন্তমূলক কাজ করেছেন। এঁরাও টেরিজা সম্পর্কে লিখেছেন, মাদার টেরিজা একজন মৌলবাদী রোমান ক্যাথলিক। সেবার ছদ্মবেশে তিনি আসলে ক্যাথলিক সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেছেন।

সিস্টার অব মিশনারিজ রাঁচীর দুই সিস্টারকে শিশু পাচারের অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরই ঝুলি থেকে বিড়ালটি বেরিয়ে পড়েছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের শোনভদ্রর বাসিন্দা এক দম্পতি প্রীতি

ক্রিস্টোফার হিচেন্স

আগরওয়াল এবং সৌরভকুমার আগরওয়াল রাঁচীতে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে অভিযোগ দাখিল করলে পুরো ঘটনাটি জনসমক্ষে আসে। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন রূপা কুমারী জানিয়েছেন, 'উত্তরপ্রদেশের ওই নিঃসন্তান দম্পতি রাঁচীর বাসিন্দা অনিমা নাম্নী জনৈকা মহিলার মাধ্যমে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে মিশনারিজ অব চ্যারিটি থেকে একটি শিশুকে দত্তক নেন। গত ৩০ জুন অনিমা ওই দম্পতিকে ফোন করে শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে রাঁচী আসতে বলে। কারণ হিসাবে বলা হয়, আদালতে দত্তক সংক্রান্ত কিছু আইনগত কাজকর্ম সারতে হবে। কিন্তু আদালত চত্বর থেকে অনিমা নাম্নী ওই মহিলা শিশুটিকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। এরপর ওই দম্পতি রাঁচীর মিশনারিজ অব চ্যারিটিতে ছুটে যান। কিন্তু ওখানকার সিস্টাররা কেউই তাদের সঙ্গে দেখা করেননি। বরং, খারাপ ব্যবহার করে তাদের তাড়িয়ে দেন। এরপরই চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি মিশনারিজ অব চ্যারিটির সিস্টারদের ডেকে পাঠালে কেলেঙ্কারিটি পরিষ্কার হয়ে যায়। জেরায় সিস্টাররা অসংলগ্ন কথা বললে অনিমা নামের মহিলা এবং শিশুটির জন্মদাত্রী মাকে ডেকে জেরা করা হয়। জেরার মুখে এই দুজন জানায় এর আগেও টাকার বিনিময়ে কয়েকটি শিশুকে মিশনারিজ অব চ্যারিটির হোম থেকে পাচার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদেই জানা যায়, ঝুনু কুমারী, হেমলতা মুর্মু এবং শবনম— এই তিন মহিলার সন্তানদেরও টাকার বিনিময়ে বেআইনিভাবে বেচে দেওয়া হয়েছে। এই জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতেই রাঁচীর জেল রোডে মিশনারিজ অব চ্যারিটির একটি কেন্দ্রে তল্লাশি চালিয়ে ১৩ জন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে উদ্ধার করে সরকারি হোমে পাঠানো হয়। বলা দরকার, রাঁচীতে দু-দুটি কেন্দ্র চালায় মিশনারিজ অব চ্যারিটি। এই কেন্দ্রগুলিতে অবিবাহিতা অন্তঃসত্ত্বা এবং অন্যান্য বিপদগ্রস্ত মহিলাদের আশ্রয় দেওয়া হয়। রাঁচীর কোতওয়ালি থানার অফিসার-ইন-চার্জ এস এন মণ্ডল বলেছেন, তদন্তে জানা গেছে, এইসব অবিবাহিতা মহিলাদের সন্তানদেরই ৫০ হাজার থেকে দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দিতেন সিস্টাররা।

সেবার নাম করে এই হচ্ছে মিশনারিজ অব চ্যারিটির 'সেবার প্রতিমূর্তি' সিস্টারদের কীর্তিকলাপ। কিছু মহিলার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের সন্তানদের মোটা টাকার বিনিময়ে পাচার করার এই কারবারটি যে বেশ ভালোভাবেই চলছিল— তা বুঝতে এখন খুব একটা অসুবিধা হয় না। আর এটাও বেশ বোঝা যায়, মিশনারিজ অব চ্যারিটির কোনও একটি কেন্দ্রে সকলের অগোচরে একজন বা দুজন সিস্টারের পক্ষে এরকম কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এটা একমাত্র তখনই সম্ভব যদি এর পিছনে বড় চাঁই বা প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন এবং সহযোগিতা থাকে। রাঁচীর মিশনারিজ অব চ্যারিটির শিশু পাচার নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় নারী এবং শিশুকল্যাণ মন্ত্রী মানেকা গান্ধীও নির্দেশ দিয়েছেন, মিশনারিজ অব চারিটির সবকটি হোমেই তদন্ত চালাতে। আশা করা যাচ্ছে, এতে এবার সত্যটা প্রকাশিত হবে।

তবে, শিশু পাচার চক্রে মিশনারিজ অব চ্যারিটির জড়িত থাকার যোগ যে এই প্রথম প্রকাশ্যে এল তা নয়। এর আগে ২০১১

সালেও একটি ঘটনায় মিশনারিজ অব চ্যারিটির বিরুদ্ধে শিশু পাচারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল। সেবার ঘটনাটি ঘটেছিল শ্রীলঙ্কায়। ২০১১ সালে শ্রীলঙ্কায় মিশনারিজ অব চ্যারিটির কেন্দ্র 'প্রেম নিবাসে'র সিস্টার মেরি এলিজাকে শিশু পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এর পর শ্রীলঙ্কার আদালত প্রেম নিবাসের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। শ্রীলঙ্কার ন্যাশনাল চাইল্ড প্রোটেকশন অথরিটি এই ঘটনার পর কলম্বোর একটি আদালতে আবেদন জানিয়ে বলে যে, প্রেম নিবাস থেকে বহু শিশুকে বিদেশিদের কাছে বেআইনিভাবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এই আবেদনের পরে কলম্বোর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রেম নিবাসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মিশনারিজ অব চ্যারিটির এই শিশু পাচার চক্র কেবল ভারত, নেপাল বা শ্রীলঙ্কার ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। ২০১১ সালে বিবিসি-র একটি তথ্যচিত্রে দেখানো হয় কীভাবে গত ৫০ বছরে স্পেনে ক্যাথলিক চার্চের মাধ্যমে ৩ লক্ষ শিশুকে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে চুরি করে টাকার বিনিময়ে পাচার করে দেওয়া হয়েছে। ওই তথ্যচিত্রে এ-ও তুলে ধরা হয় চার্চের বিশপ, সিস্টার, একশ্রেণির ডাক্তার এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যোগাযোগে গড়ে ওঠা চক্র এই কাজ করছে। জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর শাসনকাল থেকে শুরু হয়ে এই চক্র এখনও সক্রিয় রয়েছে।

ভারতে করা একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রতি বছর সরকারি ভাবে প্রায় ৫ হাজার শিশুকে দত্তক দেওয়া হয়। কিন্তু চার্চ এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত হোমগুলি থেকে সমস্তরকম সরকারি নিয়মকানুনকে অগ্রাহ্য করে প্রতি বছর এর প্রায় দশগুণ বেশি শিশুকে দত্তক দেওয়া হয়। এবং এই শিশুর বেশির ভাগটাই আসে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র হিন্দু ও আদিবাসী পরিবার থেকে। নেপালেও মিশনারিজ অব চ্যারিটির বিরুদ্ধে ধর্মান্তরকরণ এবং শিশু পাচারের অভিযোগ রয়েছে।

এতো গেল শিশু পাচারের ঘটনা। কিন্তু ক্রিস্টোফার হিচিন্স এবং অন্যান্য টেরিজা-বিশেষজ্ঞরা মাদার টেরিজার বিরুদ্ধে আরো নানারকম অভিযোগ এনেছেন। এর মধ্যে একটি বড় অভিযোগ অসৎ ব্যক্তিকে সঙ্গ দেওয়া। ক্রিস্টোফার হিচিন্স তাঁর গ্রন্থে রবার্ট ম্যাক্সওয়েল এবং চার্লস কিটিং জুনিয়রের মতো কুখ্যাত জালিয়াত-ঠগবাজদের সঙ্গে মাদার টেরিজার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। হিচিন্স তথ্য প্রমাণসহ দেখিয়েছেন ম্যাক্সওয়েলের সংবাদপত্র গোষ্ঠী মিরর গ্রুপের জন্য তহবিল সংগ্রহের একটি অভিযানে টেরিজা জড়িত ছিলেন। এই অভিযানে যে অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল তা ম্যাক্সওয়েল আত্মসাৎ করে দেন। এমনকী ম্যাক্সওয়েলের মৃত্যুর পর এও প্রকাশ হয়েছিল যে, মিরর গ্রুপের কর্মচারীদের পেনশন ফান্ডের টাকাও ম্যাক্সওয়েল মেরে দিয়েছিলেন। এমন একটি ব্যক্তির সঙ্গে মাদার টেরিজার কী করে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল— তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হিচিন্স।

আর একজন হচ্ছেন চার্লস কিটিং। ৮০-র দশকে মার্কিন মুলুকে সবথেকে বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির নায়ক ছিলেন এই কিটিং। দশ বছর কারাদণ্ডও ভোগ করেন তিনি। আর্থিক বিনিয়োগের লোভ দেখিয়ে বাজার থেকে ২৫২ কোটি মার্কিন ডলার তুলে তা আত্মসাৎ করেছিলেন। পাঁচজন মার্কিন সেনেটরকে প্রচারের খরচ জুগিয়ে তাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছিলেন। এহেন কুখ্যাত কিটিং মাদার টেরিজাকে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ডলার দিয়েছিলেন। অবশ্য নিজের পকেট থেকে এই টাকা দেননি। দিয়েছিলেন, বাজার থেকে যে টাকা তুলে তিনি মেরে দিয়েছিলেন, সে টাকারই একটি অংশ। এছাড়াও নিজের বিলাসবহুল বিমানটি মাদার টেরিজাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন কিটিং। জালিয়াতি এবং অর্থ তছরুপের অভিযোগে যখন ক্যালিফোর্নিয়ার আদালতে কিটিংয়ের বিচার চলছিল, তখন বিচারপতি লান্স ইটোকে পত্র লিখে টেরিজা কিটিংকে ক্ষমা করে দেওয়ার অনুরোধ জানান। এই চিঠির উত্তরে বিচারপতির পক্ষ থেকে ডেপুটি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি পল টার্লি মাদার টেরিজাকে লিখেছিলেন, 'আমি আপনাকে বলছি, আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, এক্ষেত্রে প্রভু যীশু কী করতেন? একজন তস্কর যদি তাঁকে ভাঙিয়ে শাস্তির হাত থেকে রেহাই চায়— কী করতেন তিনি?'

মিশনারিজ অব চ্যারিটির সিস্টাররা শিশু পাচারের ঘটনায় হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন চার্চের বিশপরা, অরুন্ধতী রায়, সাগরিকা ঘোষ, সীতারাম ইয়েচুরি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সেকুলার বামপন্থীরা ময়দানে নেমে পড়েছেন এদের আড়াল করতে। এদের অন্যায় ঢাকতে এই মিশনারি-বামপন্থী-সেকুলাররা একযোগে বলছেন, এর পিছনে গেরুয়া শিবিরের চক্রান্ত আছে। কিন্তু সাহস করে একথা বলতে পারছেন না, অভিযোগ যখন উঠেছেই তা নিয়ে তদন্ত হোক। কেন্দ্রের নারী এবং শিশুকল্যাণ মন্ত্রক মিশনারিজ অব চ্যারিটির সবকটি হোমে তদন্ত চালাতে বলেছে। সত্যিই একটি যথাযথ তদন্ত দরকার। সর্বসমক্ষে প্রমাণ হওয়া দরকার, সেবার আড়ালে মিশনারিদের প্রকৃত মুখটি কী?

পল টার্লি মাদার টেরিজাকে ওই চিঠিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছিলেন। লিখেছিলেন, 'কেউ যদি অন্যের টাকা চুরি করে এনে প্রভু যীশুকে রাখতে দিতেন, তিনি কী করতেন? তিনি অবশ্যই সে টাকা যাদের তাদের ফেরত দিতেন। আমি আপনাকে বলছি, কিটিং আপনাকে যে টাকা দিয়েছিলেন, তা তার নিজের টাকা নয়। অন্যের টাকা চুরি করে এনে আপনাকে দিয়েছিলেন। আপনি যদি সে টাকা ফেরত দিতে চান, তাহলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমি বলে দেব ও টাকা আসলে কাদের।' বলাই বাহুল্য, টাকা ফেরত তো দূরের কথা, মাদার টেরিজা এই পত্রের কোনও উত্তরই দেননি। ■

সংশোধনী

স্বস্তিকার ১৬ জুলাই সংখ্যায় অভিজিৎ চক্রবর্তীর নিবন্ধের শিরোনাম ভুল ছাপা হয়েছে। সঠিক শিরোনাম 'যাদবপুরে ছাত্রদের মগজ ধোলাইয়ের পাণ্ডা কারা? বলি শিক্ষকরাও'। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা

শ্রীমতী টেরেসার কাণ্ড-কারখানা

অমলেশ মিশ্র

শ্রীমতী টেরেসার জীবনের তিনটি মূলমন্ত্র— খ্রিস্টান হও, গর্ভপাত কোরো না, গর্ভনিরোধ কোরো না, দরিদ্র সুন্দর, তাই গরিবদের গরিব থাকায় কোনও দোষ নাই। গরিবরা রোগের কষ্ট বরণ করে নিক।

শিশু পাচারের অভিযোগে ধৃত এক নান ও পরিচারিকা।

১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট ম্যাসিডোনিয়ার স্কেপিও শহরে যে মেয়েটি জন্ম নিয়েছিলেন তার নাম ছিল অ্যাগনেস গনজে কোয়াহাজু। তিনিই পরবর্তী কালে মাদার টেরেসা।

শ্রীমতী টেরেসার কাজকর্ম নিয়ে দীর্ঘ ৮ বছর গবেষণা করেন ইংলন্ডবাসী কলকাতার ডাঃ অরূপ চট্টোপাধ্যায়। মানসিক অসুখের চিকিৎসক। ২০০৩ সালে তার একটি বই বেরোয়— মাদার টেরেসা —দি ফাইন্যাল ভয়েডিক্ট। প্রকাশক মিটিয়র বুক্স্ ক্যালকাটা ও লন্ডন। বাংলায় অনুবাদ করেছেন রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশ : অমৃতশরণ প্রকাশন, বিদ্যাসাগর রোড, কলকাতা-৭০০১২৬। ১৫ নং ও ৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি ও বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্রে পাওয়া যায়। দাম : ৯০ টাকা।

টেরেসা যে একজন ভণ্ড, অর্থলোলুপ, মিথ্যাচারী খ্রিস্টধর্ম প্রচারক ছিলেন— আজ থেকে ১৫ বছর আগেই ডাঃ চট্টোপাধ্যায় প্রয়োজনীয় তথ্য সহ লিখেছেন এবং সেই বই বা তার লেখক-প্রকাশকের নামে কোনও আইনি ব্যবস্থা কেউ নিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। ফলে ধরে নেওয়া যায় ডাঃ চট্টোপাধ্যায় যা লিখেছেন তা সর্বাংশে সত্য। তিনি কিছুদিন ওই সংস্থায় কাজ করেছেন।

টেরেসার এই ধরনের চরিত্র বিশ্লেষণ করে এই প্রবন্ধ-লেখকও একটি ৩০ পৃষ্ঠার পুস্তিকা ২০১৪ সালে প্রকাশ করেছিলেন— 'টেরেসা আমাদের বদনাম করেছেন নিয়েছেন প্রচুর, দেননি কিছুই।'

এই ধরনের এক কপট খ্রিস্টান মিশনারির এই লজ্জাকর উত্থানের পিছনে— (১) ম্যালকম মাগারিজ, (২) ডমিনিক ল্যাপিয়ের (৩) ভ্যাটিকান পোপ (৪) ভারতের সরকারের একদা ক্ষমতা কেন্দ্র একজন খ্রিস্টান মহিলা এবং (৫) পশ্চিমবঙ্গের ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের নেত্রী, যিনি সত্য না জানলেও নিজ কারখানায় সত্য উৎপাদন করেন— এই ৫টি সূত্রের অবদান সর্বাধিক। এরা দশচক্রে নয়, ৫ চক্রে ভূতকে ভগবান বানানোর ক্ষমতা রাখেন। প্রথম দু'জন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবাদসেবী। টাকাপয়সা বা অন্য কোনও কারণে শ্রীমতীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক নষ্ট হয়। তবে তার আগেই তারা ভগবান বানিয়ে দিয়েছেন শ্রীমতীকে।

শ্রীমতী টেরেসার দুষ্কর্মগুলির বিবরণ কোনও পত্রিকার ৩/৪ পৃষ্ঠার মধ্যে সংযত রাখা সম্ভব নয়। কারণ তার মিথ্যাবাদীতা, সেবাকাজের প্রবঞ্চনা, তার সম্পর্কে যত গালগল্প প্রচলিত সেগুলি, তার নামের চলচ্চিত্রে মিথ্যার জাল, তার অর্থলোলুপতা, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রকাশ্য এবং গোপন কৌশল, কলকাতাকে বিশ্বের চোখে আস্তাকুঁড়ের শহর বলে পরিচিত করা; তার নির্মল হৃদয় আশ্রম, শিশুদের (অবৈধ বা বৈধ) দত্তক দেওয়ার নাম করে সংগ্রহ (বিক্রি), তার মৃত্যু, তার জন্ম হওয়ার বৃত্তান্ত সবই মিথ্যার জালে মোড়া। সেই মহাভারত ৩/৪ পৃষ্ঠার মধ্যে কোনও ব্যাস, বাল্মীকি বা কালিদাস পারবেন না, আমরা তো সামান্য কলমচি।

১৯৫০ সালে পোপ-এর সম্মতি নিয়ে মিশনারিজ অব চ্যারিটিজ প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৭০ সাল পর্যন্ত টেরেসার নাম কলকাতায় বা ভারতে অপরিচিত ছিল।

কলকাতা থেকে ১৯৭৩ সালে হু ইজ হু ইন ইন্ডিয়া একটি বই ছাপা হয়েছিল। তাতে ১৭০০ চরিত্রের মধ্যে টেরেসার নাম ছিল না। ৪৫০ জনের নাম সংবলিত দি ইয়ার বুক অ্যান্ড হু ইজ হু-তে (এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স) টেরেসার নাম প্রথম পাওয়া যায় ১৯৭৮ সালে। দিল্লি থেকে প্রকাশিত ফেমাস ইন্ডিয়া, নেসল্স্ হু ইজ হু পুস্তকে ১৯৭৯ সালের আগে শ্রীমতীর নাম ছিল না। ১৯৭৯-তে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সাংবাদিক ম্যাগারিজ এর সঙ্গে শ্রীমতী টেরেসার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে লন্ডনের ক্যাভেন্টিস স্কোয়ার হোলি চাইল্ড কনভেন্টে। ১৯৬৯ সালে ৫ দিনের সুটিং করে ম্যাগারিজ সৃষ্টি করলেন মাদার টেরেসা অব্ ক্যালকাটা। ডিসেম্বরে ওই ছবি মুক্তি পেল।

ইংলন্ড থেকে প্রকাশিত ক্যাথলিক পত্রিকা দি ট্যাবলেটে, নোবেল প্রাপ্তি নিয়ে কলকাতার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে গিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় এস. কে. ঘোষের লেখা একটি পত্রের

উল্লেখ আছে। তাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শ্রী ঘোষ লিখেছেন, ''কিন্তু মাদার টেরেসার কলকাতা ও ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অন্য কোনও দেশ বা শহর তাঁকে এত সহায়তা দেবে না এবং তঞ্চকতার দ্বারা ধর্মান্তরকে সমর্থন করবে না।''

টেরিজার মানসপ্রতিমার পারদ চড়তে থাকে ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ। চূড়ান্তে পৌঁছায় ১৯৯৪-তে। তবু ১৯৯৬-এর আগস্ট মাসে দি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় সুমীর লাল লিখেছিলেন, ''অভিযোগ উঠেছে তহবিল সংগ্রহের জন্য তিনি অসৎ ও বিবেকহীন পথ অবলম্বন করেন। তিনি স্বেচ্ছাচারী ও প্রচারকামী বলেও অভিযোগ। তিনি বলেন, ক্লিষ্ট হওয়াটা ঈশ্বর লাভের উপায়। তাদের ক্লেশ যা যীশুর ক্লেশের মতো, তাকে আধ্যাত্মিক সহায়তা দান করে। সেই জন্য টেরেসার অজস্র সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তা কোনও হাসপাতাল বা স্কুল নির্মাণে ব্যয়িত হবে না। দারিদ্র উৎসাদনের জন্য কোনও বস্তির উন্নয়ন হবে না। কারণ দারিদ্র্য অসুখ ও মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর স্বার্থ জড়িত...''

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ও তদানীন্তন পুলিশ কমিশনারের বদান্যতায় কালীঘাট মন্দিরের কাছে টেরেসার নির্মল হৃদয় আশ্রম। গঠনগত ভাবে কালীঘাট মন্দিরের অংশই। বাড়িটির চারিদিকে ঘেরা দোকান, দুটো লম্বা ধরনের ঘর প্রায় ২০ ফুট চওড়া আর ৫৫ ফুট লম্বা। ভিতরে দুই সারি করে খাট পাতা। ৪৫টি করে মোট ৯০ জনের থাকার ব্যবস্থা। একটি পুরুষদের, একটি মহিলাদের। খাট বলতে ৫ ফুট লম্বা, ২ ফুট চওড়া, ছয় ইঞ্চি উঁচু। একটি নীল রঙের পলিথিন চাদর। দুটি পাশাপাশি খাটের মধ্যে ব্যবধান ১ ফুট। নির্মল হৃদয়ে কোনও জানালা নাই। পৃথিবীর একমাত্র অতিথি আবাস যার জানালা নাই। আবাসিকদের একটি অ্যাপ্রন গোছের ঢোলা পোষাক পরতে দেওয়া হয়। সবসময় বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। একজন পাহারাদার আছেন যার কাজই হল ধমকে শুইয়ে রাখা। টেরেসার দখলে অনেক ভবন থাকা সত্ত্বেও নির্মল হৃদয় সরানো হয়নি। বলা হয় এইখানেই তিনি হাজার হাজার মৃতপ্রায় মানুষকে তুলে আনতেন। এই ভবনের সংশ্লিষ্ট মর্গটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়। বস্তুতপক্ষে পুরো ভবনটাই একটি মর্গ।

মৃতপ্রায় মানুষকে শুধাতে হবে সে স্বর্গের টিকিট চায় কিনা। সম্মতিসূচক উত্তর পেলে সিস্টার একটি ভেজা তোয়ালে নিয়ে রোগীর কপাল মুছতে থাকবেন এবং বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়াবেন। গোপনীয়তা অত্যন্ত প্রয়োজন। কোনও সম্প্রদায়ের মানুষকে খ্রিস্টায়িত করা হলো— তা যেন প্রকাশ না পায়।

রোগীদের কাজে ব্যবহৃত দস্তানা বা ইনজেকশন সূঁচ ঠাণ্ডাজলে ধুয়ে আবার ব্যবহার করা হয়। পশ্চিম থেকে দান বাবদ বহু সিরিঞ্জ আসত, কিন্তু ব্যবহার করা হতো না। টেরেসার ধারণা ছিল মানুষ যতই কষ্ট পাবে ততই সে যিশুর কাছাকাছি যাবে। (তিনি নিজে যাতে কষ্ট না পান তার জন্য বড় বড় নার্সিং হোমে বিনা পয়সায় চিকিৎসা ছাড়াও তার নিজের ঘরে দেড়কোটি টাকা মূল্যের ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকতো।)

লন্ডনের টিম স্টিলওয়েল ১৯৮৯-৯০-তে এখানে স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তিনি বলেন, তাঁকে বিস্মিত করেছিল নির্মল হৃদয়ের বাসিন্দাদের অসম্মান। এটিকে তার বন্দি শিবির মনে হয়েছিল। আবাসিকদের থেকে রাস্তার লোকেরা ভালো অবস্থায় ছিল। এর কারণ ভয়াবহ নিম্নমানের চিকিৎসা এবং আবাসিকদের প্রতি সন্ন্যাসিনীদের দুর্ব্যবহার।

লন্ডনের এক চিকিৎসক ডাঃ রিচার্ডসন ১৯৮০ সালে কয়েক মাসের জন্য কালীঘাটে সেবা কাজ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, ''ওষুধগুলো ১০-১২ বছরের পুরানো। ব্রাদাররা ওইগুলিই রোগীর উপর প্রয়োগ করে। তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বোধ ও জ্ঞান নাই। সূঁচগুলি বড়শির কাঁটার মতো। ব্রাদারদের চিকিৎসা ব্যয়-বহুল। প্রত্যেকের জন্য ২০ হাজার টাকার মতো। চিকিৎসার পেশাদারি নৈপুণ্য, জীবনদায়ী ওষুধ ও সরঞ্জাম ইত্যাদির ভার ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। আমার ক্যাথলিক ধর্ম ছেড়ে দেওয়ার কারণ মাদার টেরেসার কাজ করার তিক্ত অভিজ্ঞতা। দেখলাম কয়েকটি হিন্দু সংগঠন অল্প সামর্থ নিয়েও অসাধারণ কাজ করছে।''

১৯৫৭ সালে শিশুভবনের বাসিন্দার সংখ্যা ছিল ৯০। এখন প্রায় ৩০০। একটি নতুন বাড়ি হয়েছে বিকলাঙ্গদের জন্য। একটি খাটে ৫-৮ জন শিশুকে রাখা হয়। একই বোতলে ও ঠোঁট লাগানো কাপে একাধিক শিশুকে খাওয়ানো হয়। শিশুরা পায়খানা করার পর একটি ন্যাতায় সকলের পাছা মোছানো হয়।

স্যাম ওয়েস্ট মাটন লিখেছেন— নির্মল হৃদয় আমাকে ততটা আঘাত দেয়নি, যতটা শিশুভবন। টেরেসার জীবনকালে বেলজিয়ান কোম্পানি বেলগোমিস্ক মনিভাইস অনাথ আশ্রমের জন্য গুঁড়ো দুধ সরবরাহ করত। কিন্তু সেগুলি ছিল অতিশয় নিম্নমানের। রয়টারের দেওয়া তথ্য অনুসারে পৃথিবীর ১২০টি দেশে টেরেসার ৫৬৭টি ভবন আছে। সেগুলি প্রায় সবই সন্ন্যাসিনী ও ভ্রাতাদের জন্য।

শ্রীমতী টেরেসার ধনদৌলতের কোনও সীমা ছিল না। এই সংস্থার মূল ব্যাঙ্ক ছিল ইটালির ভ্যাটিকান সিটিতে। ওটি পোপের সাম্রাজ্য। ইটালি সরকার নাক গলাতে পারে না। যে কোটি কোটি টাকা তিনি সংগ্রহ করতেন সবই থাকত ওখানে। এখানে কলকাতায় স্ট্যান্ডার্ড এবং চাটার্ড ব্যাঙ্কে তার সংস্থার কিছু টাকা থাকত। এদেশ বা এই কলকাতা থেকে তিনি যে লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন তাও এদেশে ব্যয় করেননি।

টেরেসা সংক্রান্ত ছবিগুলিতে কলকাতা কুষ্ঠরোগীর শহর ও আস্তাকুঁড়ের শহর বানিয়ে তার উন্নতিতে বিদেশ থেকে অর্থসংগ্রহ করেছেন।

টেরেসার জীবনী নিয়ে একটি চলচ্চিত্রের নাম—মাদার টেরেসা : ইন দি নেম অব গডস্ পুয়োর। ছবিটি কলকাতা নিয়ে হলেও এর অভিনেতা বর্গ থেকে কর্মী কেউই কলকাতার নয়। ছবি হয়েছে শ্রীলংকায়। ছবিতে দেখানো হয়েছে কলকাতার অরুচিকর রাস্তা দিয়ে দেবদূতীর মতো হেঁটে চলেছেন টেরেসা। টেরেসা এক পুলিশ অফিসারের কাছে প্রার্থনা করছেন, মতিঝিল বস্তির কাছে আবর্জনা যেন তুলে না নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ ওই আবর্জনা ঘেঁটেই কাগজ কুড়ানিরা কাগজ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

গত শতাব্দীর ষাটের-সত্তরের দশকে মিশনারিজ অব চ্যারিটির আয়ের, একটি বড় উৎস ছিল সন্তানহীনদের সন্তান দত্তক (বিক্রি) দেওয়া। দত্তক নেওয়ার জন্য সন্তান ক্রয় করা যায় না, তাই দান দেখাতে হয়। দত্তকগুলি সাধারণত বে-আইনি শিশু, তাই অনাথ গর্ভপাত বিরোধী টেরেসা বিবাহ বহির্ভূত পথে উৎপাদিত সন্তান সন্ততি সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করতেন না। প্রায়ই আস্তাকুঁড়ের পাশে তিনি এইরকম শিশু কুড়িয়ে পেতেন। যত অনাথ হয়, তত ভালো দত্তক দেওয়া যায়। ১৯৮০ সালে সাত বছর বয়স্ক সনাতন ধরকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দান নিয়ে এক বেলজিয়ামবাসীকে দেওয়া হয়। ১৯৯৩-২০০১ সালের মধ্যে সে অনেকবার ভারতে এসেছে তার দিদি সরসীর খোঁজে। এখন তার নাম Sanatan Paueif.

শ্রীমতী টেরেসার জীবনের তিনটি মূলমন্ত্র— খ্রিস্টান হও, গর্ভপাত কোরো না, গর্ভনিরোধ কোরো না, দরিদ্র সুন্দর তাই গরিবদের গরিব থাকায় কোনও দোষ নাই। গরিবরা রোগের কষ্ট বরণ করে নিক। ▮

ভারতে খ্রিস্টিয়ান ধর্মপ্রচারের নামে নীতিহীন দুষ্কর্ম আর 'মাদার' টেরিজা

অচিন্ত্য বিশ্বাস

ছলনা অত্যাচার বিভ্রান্তিকর প্রচার আর বাণিজ্য এর মাধ্যমেই পৃথিবী আজ খ্রিস্টিয়ান জনগোষ্ঠীর প্রতাপ সহ্য করছে। নৈতিকতার ধার ধারে না যাজক সম্প্রদায়। কখনো ক্বচিৎ বাণিজ্যিক স্বার্থ আর চার্চ-মিশনের স্বার্থের ঠোকাঠুকি হয়েছে— সেজন্যই ভারত আজও পুরোপুরি খ্রিস্টিয়ান হয়ে যায়নি। এ লেখার শুরুতে সেই সংঘাতের ছবিটি দেখাই।

১৭৯২ থেকে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় সিভিলিয়ান হিসাবে কাজ করেছেন টমাস টুইনিং। তিনি ধর্মযাজকদের অতি সক্রিয়তা ঘটলে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে শাসন চালানো সম্ভব হবে না বলে মনে করতেন। এ নিয়ে কোম্পানির বোর্ড তথা কোর্ট অব ডিরেক্টারের উদ্দেশ্যে প্রচুর চিঠি চালাচালি হয়। এক পক্ষে ধর্মযাজকদের সুবিধা প্রার্থনার দাবি, অন্যদিকে প্রশাসকদের চিঠি-চাপাটিকে 'pamplet war' নামে অভিহিত করা হয়। ঘটনার সূত্রপাত তামিলনাড়ুর ভেলোর অঞ্চলে। খ্রিস্টিয়ান মিশনের বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ (forced Conversion to Christianity)-এর বিরুদ্ধে স্থানীয় সিপাইদের তীব্র প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে যাজকদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়--- কোম্পানির লোকজন তাদের সাহায্য করছে না। তখন ভেলোরে বাণিজ্য কুঠির অধ্যক্ষ ক্রাডোক বা মাদ্রাজের গভর্নর বেন্টিঙ্ক এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ ছিলেন! ঘটনাটি লন্ডনে কোম্পানি পরিচালকবর্গ আর আদালত অবধি গড়ায়। কোম্পানি ব্যবসা বাণিজ্যকেই প্রাধান্য দিচ্ছে কেন? যাজকদের এই অভিযোগ উড়িয়ে টুইনিং লিখেছিলেন : এদেশের ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। যদি 'সদাপ্রভু'র নাম করে খ্রিস্টিয়ান ধর্মপ্রচার বৃদ্ধি পায় এদেশের প্রতিক্রিয়া হবে অকল্পনীয় আর 'from one end of Hindustan to the other, and the arms of fifty millions of people will drive us from the portion of the globe'! টুইনিং-দের মতো প্রশাসকরা না থাকলে কী হতো— সেকথা ভাবার দরকার দেখছি না।

ভারতে খ্রিস্টিয়ান ধর্মপ্রচারের চেষ্টা ইসলামের আক্রমণ হামলার বহু পূর্ববর্তী ঘটনা। পশ্চিম উপকূল ধরে তারা এদেশে কুসংস্কার- ভেল্কিবাজি চমৎকার দেখিয়ে ভুল বুঝিয়ে প্রবেশ করেছে— সাধারণ মানুষ দেরি হলেও এদের কৌশল বুঝতে পেরে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। মুম্বাইয়ের কাছে কল্যাণ। এর কাছে ছিল 'বেনি ইস্রায়েল'।

> আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টিকে খ্রিস্টিয়ান সমাজের বিরুদ্ধে বিজেপির ষড়যন্ত্র বলে হুঙ্কার দিয়েছেন। এমন রুচিহীন যুক্তিহীন বিচারবোধশূন্য মন্তব্যের উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। আমরা চাই গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হোক। যদি প্রমাণিত হয় মিশনারিজ অব চ্যারিটিজ এই ঘটনায় যুক্ত তাহলে মাদার টেরিজার 'ভারতরত্ন' কেড়ে নেওয়ার দাবি তুলব আমরা।

ঝাড়খণ্ডের রাঁচির সেই নির্মল হৃদয় মিশন। এখান থেকেই শিশু পাচারের ঘটনার অভিযোগে দেশজুড়ে তোলপাড়। তদন্ত করে দেখছে স্থানীয় পুলিশ।

এটি ভারতের প্রথম দিকের ইহুদি-বসতি। সন্ত বার্থলোমেও এখানে আসেন। ইহুদিরা যীশুখ্রিস্টকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রী— এই অভিযোগ দু হাজার বছর ধরে তাদের তাড়া করে মেরেছে! স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিকাগো বক্তৃতায় বলেছিলেন, ভারতবর্ষ ইহুদিদের আশ্রয় দিয়েছে। ভারতবর্ষ হলো সব ধর্মকে আশ্রয় দেবার ক্ষেত্রে একমাত্র দেশ। এই গৌরব অবশ্যই স্মরণীয় ; শ্লাঘার সঙ্গে একথা আজও আমরা ঘোষণা করছি। কিন্তু একথাও সত্যি, মধ্যপ্রাচ্যে একটি অঞ্চলে উদ্ভূত তিনটি ধর্মের অভ্যন্তরীণ টানা পোড়েনে বিশ্ব আজ অশান্তির চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে--- সন্ত্রাসের অগ্নিকটাহে পুড়ছে। টুইন টাওয়ার থেকে ফিলিপিনস চেচনিয়া, বেলজিয়াম, নাইজেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া সর্বত্র এক জাহান্নামের আগুন জ্বলে যাচ্ছে। খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীতে এই দ্বন্দ্বের আঁচ পেয়েছিল কল্যাণ-এর 'বেনি ইস্রায়েল।' ইহুদিদের খ্রিস্টের বাণী শোনাতে এসেছিলেন বার্থলোমেও। স্থানীয় রাজা পুলমবি (খ্রিস্টিয়ান-সূত্রে 'polomavi' বা 'Polymins' বর্তমান লেখকের ধারণা মূল শব্দটি ছিল 'পৌলোমী') আর তার বোন অসুস্থ হয়ে পড়লে বার্থলোমেও তাঁদের বিচিত্র উপায়ে বাঁচিয়ে দেন। কৃতজ্ঞতাবশে পুলমবি আর তার বোন খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হন। রাজ্যে খ্রিস্টিয়ানদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

পুলমবি-র অগ্রজ আস্ট্রেজেস (আমার প্রস্তাব নামটি ছিল 'অস্ত্র-যশ') ধর্মরক্ষার জন্য পুলমবিকে সিংহাসনচ্যুত করলেন। খ্রিস্টিয়ানদের রাজ্যছাড়া করেন। ৬২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সন্ত বার্থলোমেও বিস্তৃত হলেন। কিন্তু খ্রিস্টিয়ানরা প্রতিশোধ নিল। আস্ট্রেজেস মাত্র ৩০ দিনের মধ্যে মারা গেলেন। আবার পুলমাবি রাজা হলেন। দীর্ঘ দু-দশক তাঁর শাসনকালে প্রথম খ্রিস্টধর্ম প্রচার হলো ভারতে।

প্রায় একই সময় এলেন সন্ত টমাস। পঞ্জাবের রাজা গোণ্ডোফারেন্স (Gondophares– এরকম বিচিত্র নাম ভারতীয়দের হওয়া অসম্ভব, 'কন্দর্পরাজ' হতে পারে)-এর আতিথ্য পেয়েছিলেন তিনি। এরপর দক্ষিণ ভারতে চোল-রাজাদের আক্রমণ রক্ষা করতে যান সন্ত টমাস। ৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পৌঁছলেন মালাবার উপকূলে। সেখানে ক্রাঙ্গানোর (Cranganore)-এর নামপুদ্রি (Nampudri ---নাম্বুদিরি নিশ্চয়) ব্রাহ্মণদের দীক্ষিত করেন। রাজা পেরুমল আর তার পরিবারের বহু সদস্য টমাসের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন বলে খ্রিস্টিয়ান সূত্রাদিতে পাওয়া যাচ্ছে। কুইলন, পালুর, মালুনকারা প্রভৃতি অঞ্চলে পেরুমলের পৃষ্ঠপোষকতায় সাতটি গির্জা গড়ে ওঠে। আমাদের চিরাচরিত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আদর্শ খ্রিস্টিয়ানদের জন্য প্রযোজ্য নয়— এদের যাজকরা বিবাহিত ভোগী জীবনে অভ্যস্ত। রাজা পেরুমল মাইলাপুরে একটি পাহাড় দান করলেন সন্ত টমাসকে। কিন্তু বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার কৌশল মাইলাপুরের স্থানীয়রা পছন্দ করেনি। তারা টমাসের গির্জা ভাঙে— সব যাজকদের উপর চড়াও হয়। ৩ জুলাই ৭২ খ্রিস্টাব্দে সন্ত টমাস তাদের হাতে মারা যান। সামান্য কিছু খ্রিস্টিয়ান নৌকা যোগে পালায় ত্রিবাঙ্কুর, ঘাট পার হয়ে কালিকটে আশ্রয় নেয়।

প্রথম দিকের সম্ভ্রান্ত বংশের যারা খ্রিস্টিয়ান হন, তারা নাকি অসবর্ণ বিবাহ অপছন্দ করত। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আসা ১৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কিছু খ্রিস্টিয়ান ধর্মপ্রচারক এসব দেখে আশ্চর্য হয়েছিল! কাতানার নামে পরিচিত নামবুদিরি তথা ব্রাহ্মণ-খ্রিস্টানরা কোঙ্কন প্রদেশে থাকতেন। তারা তাদের উচ্চম্মন্যতা ত্যাগ করেননি। একথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন।

পেরুমলের রাজার কাছে ৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়া থেকে আরেকজন টমাস— টমাস কেন ৭২টি পরিবার, ৪০০ জন সিরিয়ান খ্রিস্টিয়ান এসে বসবাসের অনুমতি পেলেন মাহাদেবর পোন্টমারু অঞ্চলে। তখন এর নাম ছিল মুসিরিন। এরা ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে। টমাস কেন হলেন পেরুমলের রাজার মন্ত্রী। ব্যবসা বাণিজ্য করা সিরিয়ান খ্রিস্টানদের নাম হলো 'পেরুম চেট্টি'। দক্ষিণ ভারতের হিন্দু ব্যবসায়ী চেট্টিদের সঙ্গে ভুল বোঝানোর জন্যই এই নাম! ভালিয়ার ভাত্তাম-এর শাসক হলেন খ্রিস্টিয়ানরা। ৮ম-৯ম শতাব্দীতে এই রাজত্ব চলল ১৩ শ শতাব্দী পর্যন্ত। ১২৯৫ খ্রিস্টাব্দে মার্কো পোলোর বিবরণে এই সংবাদ পাওয়া যায়।

আরবি শক্তির উত্থান হলো সপ্তম শতাব্দীতে। তখন তারা ভারতে প্রবেশ করতে লাগল। সে অন্য ইতিহাস। খ্রিস্টিয়ানদের পৃষ্ঠপোষক পেরুমল মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলেন। তার রাজ্য তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল--- কেজিকোড়, কোচিন আর ত্রিবাঙ্কুর। মোট কথা মধ্য প্রাচ্যের জেরুজালেম দখলের ধর্মযুদ্ধ--- জঘন্য হত্যা, অমানবিক হিংসা-প্রতিশোধ গ্রহণকে ধর্ম বলে প্রচার করার ঢেউ আরব সাগর পার হয়ে আমাদের দেশে ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠল।

২

এর পরের ইতিহাস একই রকম। পূর্ব ভারতেও, বঙ্গোপসাগর ধরে চট্টগ্রাম-শ্রীহট্ট হয়ে বাংলায় বণিকের ছদ্মবেশে কিংবা এক হাতে বাইবেল অন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে এসে পড়লেন খ্রিস্টিয়ান সদাপ্রভুর সেবাব্রতী তথাকথিত ক্ষমাশীল মানুষ। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে কালিকটে অবতরণ করলেন ভাস্কো-ডাগামা। তার সঙ্গে এসেছিলেন পাঁচজন মিশনারি। স্থানীয় হিন্দুরা এই সব ধর্মযাজকদের উপর ১৫০১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চড়াও হন। তাদের তিনজন মারা যান। দুজন পালান কোচিনে। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগিজরা গোয়া দখল করেন। তারপর কতবার সেখানে শান্তি দুর্গার মন্দির ধ্বংস করে বলপূর্বক খ্রিস্টিয়ান করে তাদের দুঃশাসন চলেছে, সে দীর্ঘ ইতিহাস।

ফ্রান্সিস জেভিয়ার ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে তামিলে বাইবেল অনুবাদ করেন। তার প্রভাবে তামিলনাড়ু শ্রীলঙ্কায় খ্রিস্টিয়ান ধর্ম প্রচার হয়। লোভ-প্রতিপত্তি আর জয়— দান খয়রাত করে এই রাজনৈতিক- ব্যবসায়িক ধর্ম প্রচার চলতে থাকে।

১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে সপ্তগ্রামের কাছে সামান্য পা ফেলার জায়গা পায় খ্রিস্টিয়ানরা। ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ প্রতাপাদিত্য মুসলমান- আধিপত্য দূর করার কৌশল হিসাবেই সম্ভবত আহ্বান করলেন

পেড্রোতাভাবেস-কে। সঙ্গে এল ডে-সুজা আর ফনসেকা- যাজক দল। তারা এলেন, গড়লেন কয়েকটি গির্জা। ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ঢুকল খ্রিস্টিয়ান ধর্মপ্রচারকরা।

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যান্ডেল বন্দর গড়ার জন্য পোর্তুগিজরা সাতশো সাতাত্তর বিঘা জমি পেলেন শাহজাহানের কাছে। সর্বত্রই ব্যবসা-অস্ত্র- দাসব্যবসা আর খুন জখমের হাত ধরে ঢুকল খ্রিস্টিয়ান ধর্ম। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে এই হুগলী জেলায় খ্রিস্টিয়ানদের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিওকে আরাকানের মুসলমান জলদস্যুরা চুরি করে— তাকে ছিনিয়ে নেয় পোর্তুগিজরা। এই তো খ্রিস্টিয়ানদের ধর্মপ্রচারের ইতিহাস। সেবাধর্মের আসল স্বরূপ। এই প্রেক্ষিতে মাদার টেরিজা আর তাঁর 'নির্মল হৃদয়' বা 'Missonaries of Charity'-সংক্রান্ত বিতর্ককে বিচার করতে হবে।

৩

মাদার টেরিজা (২৬.৮.১৯১০-৫.৯.১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ) আলবেনিয়া থেকে আসা সেবাব্রতী। ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মরণোত্তর সন্ত-মর্যাদা লাভ করেন। যুক্তিহীন কুসংস্কার, বিচিত্র মরমিয়া জীবন বোধ ছাড়া অন্য কিসের ভিত্তিতে এই সন্ত-মর্যাদা? সবাই জানেন, কয়েকজন ভক্ত শিষ্যের সাক্ষ্য মেনে টেরিজার আধিভৌতিক দৈবী ক্ষমতার কথা, রোগ সারিয়ে দেবার দাবির উপর ভিত্তি করেছেন ধর্মান্ধের দল। আমাদের দেশে অনেক ইংরেজি-মাধ্যমে পড়া, বাইবেল মুখস্থ করা দেশি সাহেবদের ধারণা পশ্চিম-পৃথিবীর সবই যুক্তি বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত। তারা ভুলে যান গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রি.) ব্রুনো, নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩- ১৫৪৩ খ্রি.) প্রভৃতি যুক্তিবাদীদের সঙ্গে কী নির্মম ব্যবহার করেছিল খ্রিস্টিয়ান ধর্মযাজক আর চার্চ। বাইবেলের বিশ্ব-কেন্দ্রিক বিশ্বদৃষ্টি আর কোপার্নিকাস-গ্যালিলিওর সূর্য কেন্দ্রিক বিশ্বদৃষ্টির দ্বন্দ্বে যারা পেগানদেরও অধম হয়ে কুসংস্কারকে আশ্রয় করেছে— তাদের সভ্য যুক্তিবাদী-বিজ্ঞান বোধে স্বচ্ছ বলে যারা ভাবেন তারা কতটা শিক্ষিত,তাতে আমাদের সন্দেহ আছে! এরাই বড়দিনে পার্কস্ট্রিটে— বো ব্যারাকে হামলে পড়ে --- মাথায় লালটুপিতে মেলে স্বেচ্ছাদাসত্বের মূর্খ উত্তেজনা। মাসখানেক ধরে ঘরে ঘরে সবুজ ঝিলমিলে গাছ আর মোজার মধ্যে উপহার রেখে শিশুদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন করি তো আমারই। অথচ হিন্দু মূল্যবোধ, সংস্কার আমাদের এইসব বিকৃত মানসিকতার শিক্ষিত বর্গের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়। মাদার টেরিজা আসলে বিশ্বজোড়া খ্রিস্টিয়ান সাম্রাজ্যবাদের নির্মাণ— প্রচার মাধ্যম তাকে গড়েছে আর মূঢ় মূর্খ আত্মচেতনাহীন শিক্ষিত বাঙালি তাতে গা ভাসিয়েছে। ধর্ম-জাতি-বর্গনিরপেক্ষ সেবার কথা বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই মাদার কিন্তু তাঁর নির্মল হৃদয়ে তাদেরই আশ্রয় দেবেন, যারা তার ধর্মকে স্বীকার করবে। এই মানসিকতা অবশ্যই আক্রমণাত্মক ব্যবসায়ী ধর্মপ্রচারের প্রাচীন কৌশলের নতুন একটি মুখোশ, একে সনাক্ত করা জরুরি।

এ মাসের প্রথমে হঠাৎ শোনা গেল রাঁচির 'নির্মল হৃদয়ে'র ধর্ম-যাজিকারা বেশ কিছু শিশু বেআইনি ভাবে বিক্রি করেছে। এই অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। আর যায় কোথায়, প্রচারমাধ্যমে শুরু হয়েছে যাবতীয় ক্লেদ উগরে দেওয়া। এই মানবসেবাব্রতী নির্মল সংগঠনের বিরুদ্ধে এ নাকি বিজেপি-সরকারের চক্রান্ত। কিন্তু সংবাদটি প্রথম আনে বিবিসি, যাদের নিরপেক্ষতা, বস্তুনিষ্ঠার ব্যাপারে সন্দেহ কম। কদিন পরেই দু'একজন আদিবাসী ধর্মান্তরিত যাজিকা স্বীকার করেছেন, তারা শিশু চুরি করেছেন, বিক্রি করেছেন। জাতীয় শিশু অধিকার নিবারণ সংক্রান্ত কমিশন (National commission for protection of child) এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন। তারা তো বিজেপি সরকারের আমলের সংস্থা নয়। তাছাড়া বিশিষ্ট সংবাদপত্র 'গার্ডিয়ান' লিখেছে, গত কয়েক বছরে ভারতে অন্তত ২ লক্ষ ৩০ হাজার শিশু স্রেফ হারিয়ে গেছে। এদের হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপার 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজ'-এর যোগাযোগ তাদের চোখ এড়ায়নি।

অবৈধ অবাঞ্ছিত সন্তান, যাদের অধিকাংশ কুমারী জননীর সন্তান— তাদের রোমান ক্যাথলিক চার্চের মাধ্যমে দত্তক নেবার রীতি। অথচ তারপরেও ১৯৭৯-তে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত, 'ভারতরত্ন' মাদার টেরিজার সংস্থা ১৯৫০ থেকে এই কাজ আজও করে চলেছে। 'গার্ডিয়ান'-এর সাংবাদিক জানিয়েছেন এই ভাবে তিন লক্ষের বেশি শিশু বিক্রি করে বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করেছে। সংগঠনের পক্ষে সুমিতা কুমার স্বীকার করে নিয়েছেন তারা এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আরও সাবধান হবেন—'we will take all necessary precautious.' এর পরে আর কিছু বলার থাকে না। সব ব্যাপারেই নাক গলানো আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর স্বভাব। তিনি বিষয়টিকে খ্রিস্টিয়ান সমাজের বিরুদ্ধে বিজেপির ষড়যন্ত্র বলে হুঙ্কার দিয়েছেন। এমন রুচিহীন যুক্তিহীন বিচারবোধশূন্য মন্তব্যের উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। আমরা চাই গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হোক। যদি প্রমাণিত হয় মিশনারিজ অব চ্যারিটিজ এই ঘটনায় যুক্ত তাহলে মাদার টেরিজার 'ভারতরত্ন' কেড়ে নেওয়ার দাবি তুলব আমরা। এটা কোনো ধর্মের কথা নয়— এ একান্তই নৈতিকতার প্রশ্ন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

চিঠিপত্র

তৃণমূলের বঙ্কিম ভজনা

সম্প্রতি বিজেপি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম দিবস পালনের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেস কাঁঠালপাড়ায় গিয়ে বঙ্কিম ভজনা করে এসেছে। তৃণমূলেশ্বরী কি জানেন যে শিক্ষিত মুসলমানেরা বঙ্কিমকে কী চোখে দেখেন? এখানে সামান্য দু'একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

ঢাকা সফর শেষে কলকাতা গিয়ে বঙ্কিমবাবু পূর্ববঙ্গের মুসলমানদেরকে কাক ও কুকুরের সঙ্গে তুলনা করে ১২২৭ সালের অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনে লিখেছেন—''ঢাকাতে দুই-চারদিন বাস করিলেই তিনটি বস্তু দর্শকের নয়ন পথের পথিক হইবে। কাক, কুকুর এবং মুসলমান। এই তিনটিই সমভাবে কলহপ্রিয়, অতি দুর্দ্দম, অজেয়, ক্রিয়া বাড়িতে কাক আর কুকুর। আদালতে মুসলমান।'' বঙ্কিমের আরো কিছু লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে জনৈক সরকার শাহবুদ্দীন আমেদ লেখেন—''এহেন ইতিহাস বিকৃতি, এহেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসূত কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ লেখার পরও বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সম্রাট, ঋষি। মুসলমান বিদ্বেষী বক্তব্যে ঠাসা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি শব্দও ব্যয় করেননি বরং তিনি বিভিন্ন শব্দের মালা গেঁথে বঙ্কিমের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। এই কুরুচিপূর্ণ মুসলমান বিদ্বেষী বঙ্কিমচন্দ্রকে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্ধভাবে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তিনি কট্টর সাম্প্রদায়িক লেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ, সাহিত্যের কর্মযোগী, সাহিত্য মহারথী ভগীরথের ন্যায় সাধনাকারী, বাংলা লেখকদের গুরু ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন।'' তথ্যসূত্র বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সংগ্রহ ১৯৫৫ পৃ. ২৪৪-৪৫।

অতএব তৃণমূলেশ্বরী একবার চিন্তা করে দেখবেন, এহেন বঙ্কিমের ভজনা করতে গিয়ে হিতে না বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমান ভোট না বিপক্ষে চলে যায়।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

'মাদার' সম্পর্কে নাসরিন

বাংলাদেশ ভারত খ্যাত স্বনামধন্যা লেখিকা তসসিমা নাসরিনকে কে না চেনে। এ লেখিকা সম্বন্ধে কতই না মন্তব্য কতজন করেছেন। হিন্দু হিতাকাঙ্ক্ষী এই লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে খ্যাত এই হিন্দুত্ববাদী লেখিকার ভারতরত্ন পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। উনি লিখেছেন মাদার মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ভারতের নিরীহ মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছেন। মাদারের ভারতে আসার উদ্দেশ্যই এদেশের দুর্বল মানুষকে দয়া দেখিয়ে খ্রিস্টানীকরণের জাল বিস্তার করা। যেটা এখনো চলছে। এটা শুধু আমি নই, ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী অনেক মানুষই নির্দ্বিধায় বলতে পারে। তেজস্বী লেখিকার ভাষায় যেটা পাওয়া যায়, মাদারের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কলকাতা মহানগরী নাকি কুষ্ঠের শহর। মাদারের কথায় বোঝায় এখানে যারা বাস করে, তারা মানে বেশির ভাগ কলকাতাবাসী কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত আর উনি তাদের সেবিকা। এটাই ইউরোপে প্রচার আছে। উনি কতটুকু জাতীয়তাবাদী মা ছিলেন তা একটি উদাহরণে স্পষ্ট বোঝা যাবে। বহুদিন আগে সালটা মনে নেই, বর্তমান কাগজে প্রকাশিত এক ব্যবসায়ীর বক্তব্য ছিল— সেই ব্যক্তি নাকি মা-কে বলেছিলেন, ''মা আপনার আশ্রম থেকে একটা মেয়ে দিন। আমি বিয়ে করব''। উত্তরে মা বলেছিলেন ''তুমি খ্রিস্টান হও নিশ্চয়ই দেব''। হ্যাঁ বর্তমানে শিশু বিক্রির যে কুৎসা শোনা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে মা অবশ্যই দোষী নয়। কারণ উনি অনেক দিন আগেই দেহ রেখেছেন। আর মাদারের ভারতরত্ন কেড়ে নেওয়া ঠিক কিনা সেকথা বিজ্ঞজনেরাই ঠিক করবেন। কারণ ওপরটা চক চক করলেও ভিতরটা হিরা জহরত হয় না। মাদার এদেশের অনেক অসহায় মানুষের আশ্রয়দাতা একথা সত্যি। কিন্তু উনি যদি সেবার দ্বারা এই সব মানুষের জাতীয়তা না বদলাতেন, খ্রিস্টানীকরণ না করতেন তাহলে আর কেউ না করুক আমি অন্তত তাকে পূজা করতাম।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

সমকামিতা একটা রোগ

আমরা দেখেছি, কোর্টের রায় বদলায়, বিশেষজ্ঞদের মতামত বদলায়, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বদলায়। সুতরাং আজ যে আইন তৈরি হবে কাল তা বদলাবে না, তার নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু প্রকৃতির আইন কখনও বদলায় না। অর্থাৎ সত্য কখনও বদলায় না। সুতরাং প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে আজ হোক আর কাল হোক মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

যেহেতু নারী ও পুরুষের যৌনমিলনের ফলেই দেহের উৎপত্তি, সেহেতু দেহধারী মাত্রেরই বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে প্রেম বা যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। এটাই স্বভাবের নিয়ম। কিন্তু নারীতে নারীতে বা পুরুষে পুরুষে মিলনের ফলে যেহেতু দেহের উৎপত্তি হয় না, তাই নারীতে নারীতে বা পুরুষে পুরুষে যৌনাসক্তি বা প্রেম একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। যা প্রাকৃতিক নিয়মের ঘোরতর এক ব্যতিক্রম। আর যা অস্বাভাবিক, যা প্রকৃতি বিরুদ্ধ তা রোগ নামেই অভিহিত। সুতরাং সমকামিতা ক্ষেত্র বিশেষে অপরাধযোগ্য কাজ না হলেও এটা যে এক প্রকার দেহবিকার, ইন্দ্রিয়বিকার, রুচিবিকার, মনোবিকার বা ব্যাধি— এ কথায় সন্দেহ নেই।

তাছাড়া, সত্য কখনও দু'রকম হয় না। হয় নারীতে নারীতে বা পুরুষে পুরুষে মিলন বা প্রেমকে স্বাভাবিক হতে হবে, না হয় পুরুষ ও নারীতে মিলন বা প্রেমকে স্বাভাবিক হতে হবে। একই সঙ্গে দুটোই স্বাভাবিক হতে পারে না। যেমন, জলের নীচের দিকে যাওয়াও

স্বাভাবিক এবং উপরের দিকে যাওয়াও স্বাভাবিক— এ কথা বলা যায় না। তবে সমকামীদের কাছে সমকামিতা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তাদের কাছে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই এটা রোগ নয়, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, প্রত্যেকটি রোগই মানুষের দেহ ও মনের স্বাভাবিক ব্যাপার। রোগ যেহেতু স্বাভাবিক ব্যাপার, অতএব তা রোগ নয়--- একথা আমরা বলি না। সমকামীদের মতো পাগলেরাও জানে না যে, তারা রোগগ্রস্ত। কেউ বলেন, অতীতেও সমকামিতা ছিল তাই এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রশ্ন হলো, অতীতে সমকামিতা ছিল বলেই তা স্বাভাবিক ব্যাপার হবে কেন? প্রত্যেকটি রোগই অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সুতরাং এর চিকিৎসার উপায় নিয়েই ভাবা উচিত। কারণ, রোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা বা মৌলিক অধিকারের যুক্তি প্রযোজ্য হতে পারে না। অতএব, সমকামিতাকে আইন সিদ্ধ করার কোনও যুক্তি নেই।

—নরেন্দ্রনাথ মাহাতো,
স্কুলবাজার, পশ্চিম মেদিনীপুর।

লুণ্ঠিত জগন্নাথ মন্দিরের কথা

গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের লুণ্ঠনের ঘটনায় আমরা ইসলামের প্রকৃত চরিত্র জানতে পারি। শান্তির (?) প্রতীক ইসলামের দোয়ায় কত শত মন্দির ধ্বংস ও মসজিদে ধর্মান্তরিত হয়েছে, সে সব ঘটনা নিয়ে ভারতীয় ইতিহাসবিদরা গবেষণা করে না। তারা অনুসন্ধান ও প্রচার চান না। তবু সত্য কিন্তু সত্যই। একদিন না একদিন তা প্রচারের আলোকে আসবে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরও যে নানাভাবে লুণ্ঠিত হয়েছিল, সে ইতিহাস আজও সে ভাবে প্রচারের আলোতে আসেনি। এই মন্দির ১৯ বার আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৭ বার মুসলমানদের দ্বারা ব্যাপক ভাবে ক্ষতি সাধন হয়। অস্পষ্ট সেই লুণ্ঠনের তালিকা নিম্নরূপ :

লুণ্ঠিত ঘটনার নেতৃত্ব

(১) আরব্য রক্তবাহু, (২) বাংলার নবাব ইলিয়াস শাহ, (৩) দিল্লির বাদশাহ ফিরোজ শাহ তুঘলক, (৪) ইসমাইল গাজী, (৫) কালাপাহাড়, (৬) সুলেমান কাররানি ও ওসমান, (৭) মির্জা খুরম, (৮) হাসিম খাঁ, (৯) কেশোদাস, (১০) কল্যাণ মল্ল, (১১) মকরম খাঁ, (১২) মির্জা আহম্মদবেগ, (১৩) মুতাক্কাদ খাঁ ওরফে মির্জা মকবনী, (১৪) আমির ফতে খাঁ, (১৪) ওক্রাম খাঁ, মস্তরাম খাঁ, (১৬) তকি খাঁ, (১৭) অলেখ ধর্মের প্রতিনিধি (বীরকিশোর)। প্রচারের আলোয় আসেনি, এমন বহু মন্দির যা ঐস্লামিকাদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও ধর্মান্তরিত হয়েছে। সে ইতিহাসও যেমন করুণ, তেমনি বড়ও।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্বমেদিনীপুর।

আত্মম্ভরী গান্ধীজী

আত্মম্ভরিতা এবং অবিমৃশ্যকারিতা এই দুই গুণের অধিকারী গান্ধীজীর ১৯১৯ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নামক এক রাজনৈতিক মঞ্চে প্রথম পদার্পণ। তখন ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের সবে মাত্র প্রস্তুতি চলছে। এই অসহযোগ আন্দোলন পুরোটাই গান্ধীজীর মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল না, এই অসহযোগের সঙ্গে গান্ধীজীর নির্দেশ মতো খিলাফত যুক্ত করা হলে পরবর্তীকালে অনেক ভেবে চিন্তে গান্ধীজীর নামের সঙ্গে পুরো আন্দোলনটাই যুক্ত হয়ে যায়। ১৮৯৩—১৯১৪ গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান করছিলেন চাকরির সূত্রে। তখন সেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের উপর শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের জাতিগত ও বর্ণগত অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলছিল। ১৮৯৯ সালে 'দ্বিতীয় বুয়রযুদ্ধে' ইংরেজ সরকারের পক্ষে সেনাবাহিনীতে যোগদান এবং স্ট্রেচারবাহকের কাজ করে ইংরেজ প্রভুদের নিকট হতে প্রশংসাপত্র ও পদক লাভ করেছিলেন। এই ঘটনা ডি.জি. তেন্ডুলকরের 'মহাত্মা' গ্রন্থে ভল্যুয়ম (এ)-তে আরও বিস্তারিত উল্লেখ আছে। ১৯১৬-তে লক্ষ্ণৌ চুক্তি অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়। ১৯১৯-এ তুরস্কের 'খিলাফত' প্রশ্নে ভারতে মুসলমানদের মধ্যে তুমুল ক্ষোভ অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। গান্ধীজী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফত যুক্ত করে দেন। যে খিলাফত তত্ত্বগত দিক থেকে ছিল ভারতের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী। সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গান্ধী পুরোভাগে চলে এলেন এবং আন্দোলনের মাঝপথে তুরস্কের খলিফার পদ বিলুপ্ত হলে এখানকার আন্দোলনের গুরুত্ব হারিয়ে যায় এবং অসহযোগ আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়। অহিংসবাদী গান্ধীজীর প্রথম নেতৃত্ব বিফল হলো। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামক এক অবিমৃশ্যকারী ও আত্মম্ভরী নেতার চেতনার গভীরে কোনও অনুশোচনার লক্ষণও খুঁজে পাওয়া গেল না। এর কিছুকাল পর ১৯২৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে খিলাফত আন্দোলনের মহান নেতা মৌলানা মহম্মদ আলির বাসগৃহে একটানা তিন সপ্তাহ ধরে অনশনে বসেছিলেন। ৬ অক্টোবর গান্ধীজী অনশন তুলে নিলেন। কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদীরা এই সময়কালটাকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরল দৃষ্টান্ত বলে থাকেন। যাই হোক, জাতির জনকের আত্মম্ভরিতার আর এক দৃষ্টান্ত দিয়ে এই লেখার ইতি টানবো— গান্ধীজী তাঁর পুত্র দেবদাসকে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের নিকট ১৯২৪-এর আগস্টের কয়েকমাস আগে পাঠিয়েছিলেন অহিংসা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টভঙ্গি কী জানার জন্য। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে বলেছিলেন— ''মনে করো আফগানরা ভারত আক্রমণ করলো, তাহলে তুমি কীভাবে তার প্রতিরোধ করবে?'' এরপর আর কোনও প্রশ্ন করেছিল বলে মনে হয় না। গান্ধীজী অহিংস পথকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অন্ধভক্তির বিষয় করেছিলেন যার ফলশ্রুতি মুসলমান ঐক্যের নিকট হিন্দুর ঐক্য বারবার বাধাপ্রাপ্ত হওয়া এবং হিন্দুদের নিজেদের সংগঠিত হতে না দেওয়া। পরবর্তীকালে এর বিষময় ফল হিন্দুদের ভোগ করতে হয়েছে।

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

স্লিপ ডিস্ক ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

ব্যথা শব্দটা কেমন যেন বেদনাদায়ক। ব্যথার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই বাচ্চা বা বয়স্ক, গরিব কিংবা বড়লোক কারুরই। বিশেষ করে মেরুদণ্ডে ব্যথা হলে হাঁটাচলা বা স্বাভাবিক কাজকর্ম করাও মুশকিল হয়ে ওঠে। শিরদাঁড়ার ব্যথার বিভিন্ন কারণের মধ্যে অন্যতম স্লিপ ডিস্ক, যার ডাক্তারি নাম ডিস্ক হার্নিয়েশন।

ব্যাপারটা ঠিক কী :

ছাব্বিশটি ছোট্ট ছোট্ট হাড়ের টুকরো বা ভার্টিব্রা দ্বারা তৈরি আমাদের শিরদাঁড়া। দুটি হাড়ের টুকরোর মাঝখানে থাকে কুশনের মত ডিস্ক। নরম জেলি দিয়ে ভরা এই ডিস্ক হাড়ের ঘর্ষণ প্রতিরোধ করে হাড় ক্ষয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে। সামনে ঝুঁকে ভারি জিনিস তোলা-সহ নানান কারণে ডিস্ক স্থানচ্যুত হলে নার্ভ রুটে চাপ পড়ে শুরু হয় প্রবল ব্যথা। এরই নাম স্লিপ ডিস্ক বা ডিস্ক হার্নিয়েশন।

কী করে বুঝবেন :

ব্যথা আর ব্যথা, অল্প অথবা ভয়ানক। তার সঙ্গে কোমর থেকে পায়ের দিকে বা ঘাড় থেকে হাতে ব্যথা নেমে আসে, ঝিন ঝিন করে। শুরুতে অল্প অল্প ব্যথা যা পরের দিকে অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। স্লিপ ডিস্কের প্রধান উপসর্গ ব্যথা। তবে কত তীব্র ব্যথা হবে তা নির্ভর করে ডিস্কের মধ্যের জেলি কতটা বেরিয়ে এসেছে আর নার্ভের রুটকে কীভাবে চাপ দিচ্ছে তার উপর। ডিস্কে পিছলে গেলে প্রথম এবং প্রধান উপসর্গ হলো ব্যথা। অবশ্য কখনও কখনও যৎসামান্য ব্যথাও স্লিপ ডিস্কের উপসর্গ হতে পারে। অল্প ব্যথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সকলে অগ্রাহ্য করেন। তাই পরে ভোগান্তির মাত্রাও বাড়ে। প্রসঙ্গত ঘাড় আর কোমরের অংশে বেশি নড়চড়া হয় বলে এই দুই অংশের ডিস্ক হার্নিয়েশনের সম্ভাবনা বেশি। ঘাড়ে সমস্যা হলে ব্যথা কাঁধ হয়ে হাত পর্যন্ত পৌঁছায় আর কোমরে সমস্যা হলে ব্যথা বা ঝিন ঝিন ভাব পা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কখনও কখনও হাত পায়ের জোর কমে যেতে পারে। রাত্রি বেলায় ব্যথা বাড়ে। কখনও সমান্য হাঁটাচলা করলেও যন্ত্রণা বাড়তে পারে। সামান্য দু একটি ক্ষেত্রে মলমূত্র ত্যাগেও অসুবিধে হতে পারে। তাই কোনও ব্যথা বেদনা হলে নিজেরা পেন কিলার না খেয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। এছাড়া বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্লিপ ডিস্কের ঝুঁকি বাড়ে।

ছেলেদের ঝুঁকি বেশি :

যে কোনও বয়সেই ডিস্ক প্রোলাপ্স হতে পারে। তবে ছেলেদের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। সাধারণত ৩০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী মানুষের স্লিপ ডিস্কের সম্ভাবনা থাকলেও পুরুষদের মধ্যে এই অসুখের ঝুঁকি বেশি। মেয়েদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ সমস্যা দেখা যায় ছেলেদের মধ্যে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ৪০ উত্তীর্ণদের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। আর কাজের প্রয়োজনে যাদের নাগাড়ে বসে থাকতে হয় বা ভারি জিনিস তুলতে হয় তাদেরও রিস্ক বেশি। নিয়মিত কয়েকটি এক্সারসাইজ করে ঝুঁকি কমানো যেতে পারে।

রিস্ক ফ্যাক্টর :

রোজকার জীবনে ছোটখাটো টানাপড়েন সামনে ঝুঁকে ভারি জিনিস তোলা, বেকায়দায় পড়ে গিয়ে চোট, বাসে, অটোতে বা রিকশাতে আচমকা জোর ঝাঁকুনি, দৌড় ঝাঁপ, অতিরিক্ত দৈহিক শ্রম, ভারি এক্সারসাইজ ইত্যাদি নানান কারণে ডিস্ক হার্নিয়েশনের ঝুঁকি বাড়ে। এছাড়া নাগাড়ে বসে থাকলে আর মোটাসোটা চেহারা অর্থাৎ বাড়তি ওজনও স্লিপ ডিস্কের ঝুঁকি বাড়ায়। শুয়ে বসে আয়েসি জীবন কাটালে মেরুদণ্ডের আশপাশের পেশি দুর্বল হয়ে গিয়ে কশেরুকার মাঝে বেরিয়ে আসতে পারে।

কী কী টেস্ট করানো দরকার :

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাঁর ক্লিনিক্যাল আই দিয়েই প্রথমে ব্যাপারটা বুঝে নেন। যদি দেখা যায় হাত দিলে বা সামান্য নড়াচড়া করলেই ব্যথা বাড়ছে তখন প্রয়োজন অনুযায়ী এক্সরে, সিটি স্ক্যান, এম আর আই করতে হবে। এছাড়া রুটিন কিছু রক্ত পরীক্ষাও করা হয়। রিপোর্ট দেখে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

জটিল হতে পারে :

অনেকেই কোমর বা ঘাড়ের ব্যথাকে খুব একটা গুরুত্ব দেন না। নিজেরা ব্যথার ওষুধ খেয়ে সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টা করেন। বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখলে নার্ভ স্থায়ী ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ব্যথা ভয়ানক বেড়ে গিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। সুতরাং ঘাড় পিঠ বা কোমরে ব্যথা অবহেলা না করাই বাঞ্ছনীয়।

চিকিৎসা মানে কি সার্জারি :

একদমই নয়। অনেকের ধারণা স্লিপ ডিস্ক হলেই সার্জারি করানো মাস্ট। জেনে আশ্বস্ত হবেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় স্লিপ ডিস্ক সারিয়ে তোলা যায় (৭০ থেকে ৯০ শতাংশ) কিছু কিছু ক্ষেত্রে (১০ থেকে ২০ শতাংশ) সার্জারি করাতে হয়। ছয় থেকে আট সপ্তাহ কনজারভেটিভ চিকিৎসা করার পরেও রোগ না সারলে সার্জারির কথা ভাবতে হয়। লাম্বার মাইক্রোডিস্টেক্টমি সার্জারির সাহায্যে মেরুদণ্ডের এই ভয়ানক ব্যথা সারানো হয়। মাত্র দু থেকে তিন সেন্টিমিটার ছিদ্রের সাহায্যে অপারেশন করা হয়। অপারেশনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যথা ভ্যানিশ হয়ে যায়। ঘণ্টা চারেক পর থেকে রোগী হাঁটা চলা করতে পারেন। একদিন পরই বাড়ি ফিরে যেতে হয়। সুতরাং সার্জারির ভয়ে ব্যথা পুষে রেখে বিপদ বাড়াবেন না। তবে সমস্যা যাতে আর ফিরে না আসে তার জন্য ওজন ঠিক রাখতে হবে। নিয়মিত এক্সারসাইজ মাস্ট। আর ঝুঁকে ভারি জিনিস তোলা একেবারেই মানা। মেরুদণ্ড সোজা রেখে ভালো থাকুন।

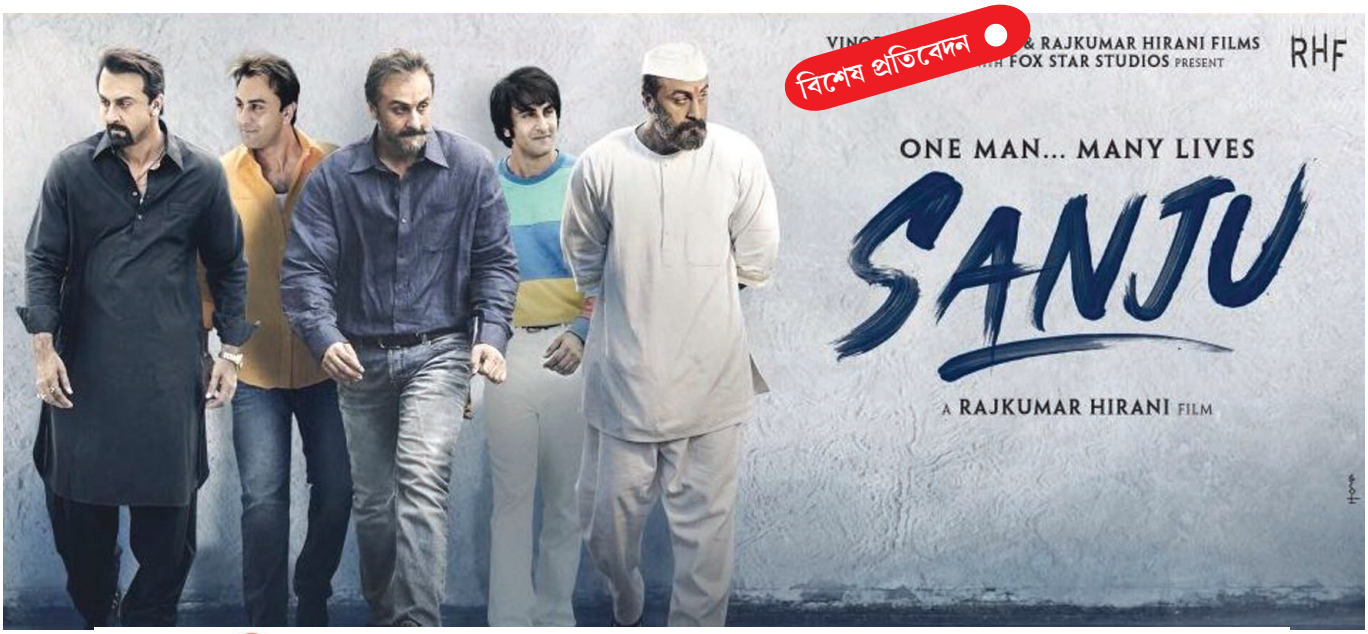

বিশেষ প্রতিবেদন

এই সিনেমা সমাজের মঙ্গলের জন্য নয়

লকেট চ্যাটার্জি

সঞ্জু ছবিটি দেখার পর আমার মনের মধ্যে ক্রমে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ ও ভাবনা জাগ্রত হচ্ছে। সঞ্জয় দত্তর উপর একটি বায়োপিক হতেই পারে। তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আগ্রহ না থাকতে পারে এই বিষয়টির প্রতি। কিন্তু আপত্তি নেই। আমি জানি সঞ্জু হিট করেছে। সঞ্জুর জনপ্রিয়তার ব্যাপারেও আমার আগ্রহ থাক বা না থাক, কী এসে যায় তাতে। কিন্তু আমার আপত্তি সম্পূর্ণ অন্য জায়গায়। আমার আপত্তি ছবিতে সঞ্জয় দত্তকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে সেই ব্যাপারে।

সঞ্জয় দত্ত যদি সঞ্জয় দত্ত না হয়ে উঠতেন, যদি না পৌঁছতেন খ্যাতি-অর্থ-সাফল্যের শিখরে, তবে কি তার জীবনের অন্ধকার দিকটাকে এমনভাবে গৌরবান্বিত করা হত? রোমান্টিসাইজ করা হতো? সঞ্জু ছবিটি দেখতে দেখতে ক্রমশ মনে হয়, সঞ্জু তার সাফল্য তার খ্যাতি ও অর্থে পৌঁছতে পারল সঞ্জয় দত্তের কুকর্মগুলির জন্যই। এবং এইজন্যেই এই ছবিটি বিপজ্জনক, ভয়ংকর। বিশেষ করে অপরিণত ছেলেমেয়েদের উপর সঞ্জু ছবির প্রভাব ভালো হতে পারে না। সঞ্জু এক অন্ধকার পৃথিবীর গল্প। সঞ্জু এক অপরাধ জগতের ছবি। এই ছবির নায়ক জড়িয়ে আছে নানা অপরাধের সঙ্গে। বিশেষ করে ড্রাগ ও সন্ত্রাস, দুটোই সমাজের পক্ষে মারাত্মক। যখন এই দুই ভয়ংকর সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সারা জগৎ রুখে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই সঞ্জু ছবিতে এই দুই অপরাধকেই দেখা হল রোমান্টিক দৃষ্টিতে।

ছবিতে যে মারাত্মক বার্তাটি দেওয়া হয়েছে, তাহলো সন্ত্রাসবাদের অপরাধে জড়িয়ে পড়েও এবং ড্রাগের নেশায় আক্রান্ত হয়েও একটি ছেলে সঞ্জয় দত্ত হতে পারে। কিন্তু সঞ্জয় দত্ত বা সঞ্জু তো ব্যতিক্রম। হাজার হাজার যুবক যুবতী প্রতিদিন কোনও না কোনওভাবে অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছে হারিয়ে যাচ্ছে। ছারখার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হাজার হাজার মধ্যবিত্ত ও গরিব মানুষের ছেলেমেয়েদের বাঁচাবার জন্য কোনও সামাজিক প্রভাব, অর্থের ও ক্ষমতার আধিপত্য কাজ করে না। তারা কেউ কিন্তু সঞ্জুর মতো বেঁচে যায় না। ফিরে আসতে পারে না। সমাজে, সংসারে, উপার্জনে, কর্মে। সঞ্জু পারল, কারণ সে বিশেষভাবে ভাগ্যবান। তার কৃতকর্মের জন্য নয়। পারল কারণ তার পিছনে আছে অর্থ ও ক্ষমতার প্রভাব। সেই কথাটি কিন্তু ছবিতে চেপে যাওয়া হয়েছে। এবং এই বাস্তব সত্যটি ছবিতে না থাকায় ছবির বার্তাটি সমাজের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠছে।

ছবিটি দেখতে দেখতে তাই মনে হয়, ড্রাগ সেবন থেকে সন্ত্রাস, অন্ধকার অপরাধ জগতের সঙ্গে সংযোগ, বিচিত্র অপরাধের দিকে প্রবণতা কোনওটাই তেমন কিছু অন্যায় নয়। কারণ শেষে তো সঞ্জয় দত্ত হওয়া যায়। সঞ্জু সেই ছবি যা মারাত্মক অপরাধ ও সামাজিক ক্ষতের গায়ে চড়া মেকআপ দিয়ে তাকে বেশ রমণীয় করে তুলেছে। আর এইখানেই আমার আপত্তি।

এই সিনেমা সামাজিক মঙ্গলের নয়, অমঙ্গলের। এই ছবি আমাদের মূল্যবোধের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। এই লেখাটি কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, সামাজিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে আমার মতামত লিখলাম আমার মতো করে।

(লেখিকা অভিনেত্রী এবং রাজনৈতিক নেত্রী)

বিশেষ প্রতিবেদন

সঞ্জয় জাতে উঠলেন রণবীরেরও হিল্লে হলো

অনন্যা চক্রবর্তী

সত্তরের দশকের শেষ দিকের ঘটনা। সদ্য মুক্তি পেয়েছে অমিতাভ বচ্চন অভিনীত ছবি ডন। ছবির একটি সংলাপ তখনই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, 'ডন কো পকড়না মুশকিল হি নেহি, নামুমকিন হ্যায়।' সাধারণ জনমানসে মাফিয়াদের ইমেজ উজ্জ্বল করে তোলার জন্য সিনেমার ব্যবহার সেই প্রথম। কারণ ডন তৈরি হয়েছিল মুম্বাই (তখন বম্বে) ডক এলাকার মুখ্য ডন হাজি মস্তানের জীবনী ভিত্তি করে। কেউ কেউ বলে থাকেন ১৯৯০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অগ্নিপথ ছবির 'বিজয় দীননাথ চৌহান' চরিত্রটির মধ্যেও হাজি মস্তানের ছায়া আছে। শুধু তাই নয়, ছবিতে অমিতাভ বচ্চন নাকি হাজি মস্তানের কথা বলার ভঙ্গিটি অবিকল নকল করেছেন।

রণবীর কপুর

বস্তুত, কোনও বিশেষ ব্যক্তির জীবন অবলম্বনে ছবি তৈরির রেওয়াজ মুম্বইয়ে নতুন নয়। ইদানীং এই ধারণার ছবির নতুন নাম দেওয়া হয়েছে, বায়োপিক। দাদাসাহেব ফালকে অভিনীত হিন্দি ভাষায় নির্মিত প্রথম ছবি রাজা হরিশচন্দ্র কিন্তু বায়োপিকই। অর্থাৎ বলিউডের যাত্রা শুরু হয়েছিল বায়োপিক দিয়ে। পরের কয়েকটি দশকে আমরা অনেক বায়োপিক পেয়েছি। বাংলাতেও তৈরি হয়েছে এই ধারায় একগুচ্ছ কাহিনিচিত্র। রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বুড়ি বালামের তীরে (বাঘা যতীনের জীবনী নির্ভর), মাইকেল ইত্যাদি এই ধারার ছবি। মাফিয়াদের নিয়ে বায়োপিক (বা 'ছায়া' অবলম্বনে নির্মিত) তৈরি শুরু হয় সত্তরের দশকে। এই তালিকায় এখনও পর্যন্ত শেষ সংযোজন, সঞ্জু। সজয় দত্তের বায়োপিক।

বক্স অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী সঞ্জু প্রথম সপ্তাহেই তিনশো কোটি টাকার ব্যবসা দিয়েছে। অর্থাৎ ছাড়িয়ে গিয়েছে বাহুবলী এবং দঙ্গলের সাফল্য। কিন্তু এমন কিছু প্রশ্ন এবং মন্তব্যের মুখোমুখি হয়েছে যা বাহুবলী বা দঙ্গলের ক্ষেত্রে শোনা যায়নি। প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার সত্যপাল সিংহ। তাঁর বক্তব্য, দাগী অপরাধীদের নিয়ে সিনেমা বানিয়ে তাদের নায়ক করে তোলা উচিত নয়। তাঁর মন্তব্য যদি একজন ব্যক্তিবিশেষের হতো, কিংবা হিন্দুত্ববাদী সরকারের একজন মন্ত্রীর, তাহলে কিছুই বলার থাকত না। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সোশ্যাল মিডিয়ার দেওয়াল ভেসে না গেলেও, ডুবুডুবু হবার উপক্রম হয়েছে। তাই দেখা দরকার ঠিক কীসের বিচারে সঞ্জয় দত্ত দাগী অপরাধী? এবং কেনই

বা তাকে নিয়ে ছবি তৈরি করা উচিত নয়।

সঞ্জয় নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন তাঁর মহিলাপ্রীতি সাংঘাতিক। তিন শতাধিক মহিলার সঙ্গে তিনি সহবাস করেছেন। সঞ্জয়ের নারীশিকারের পদ্ধতিটি ছিল বেশ গোলমেলে। কারোর সঙ্গে পরিচয় হলেই তিনি তাকে টেনে নিয়ে যেতেন অকালপ্রয়াত মা নার্গিস দত্তের কবরে। তারপর মাকে হারিয়ে ফেলার দুঃখবেদনা ইনিয়েবিনিয়ে বলে ধীরে ধীরে মেয়েটিকে আবেগপ্রবণ করে তুলতেন। এভাবেই তৈরি হতো মেয়েদের সঙ্গে নষ্টামি করার ফাঁদ। মুম্বাইয়ের খ্যাতনামা সাংবাদিক প্রভাত শিভলকর ফাঁস করেছেন এই তথ্য।

ব্যাপারটা শোনার পর যতই মজার বলে মনে হোক, সেই বয়েসেই সঞ্জয় মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করতে শিখে গিয়েছিলেন। এবং নারী হয়ে উঠেছিল তার ভোগ্যবস্তু। ছেলেকে নিয়ে কম নাকাল হননি সুনীল এবং নার্গিস দত্ত। দু'জনেই কংগ্রেসের নেতা, সাংসদ। অথচ তাদেরই ছেলে ছোটবেলা থেকে ড্রাগে আসক্ত। অনেকবার রিহ্যাবে পাঠিয়েছেন কিন্তু কোনও উপকারই হয়নি। প্রবলেম চাইল্ডের আদর্শ উদাহরণ সঞ্জয় দিন দিন বখে গিয়েছেন। এরপর এল ১৯৯৩ সাল। বিশ্ববখাটে সঞ্জয়ের উত্তরণ ঘটল বলা চলে। মুম্বই বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ উঠল তার বিরুদ্ধে।

জেল থেকে মুক্তির পর সঞ্জয় দত্ত।

বিস্ফোরণের দুই মাথা আবু সালেম এবং রিয়াজ সিদ্দিকির পাঠানো অস্ত্র তিনি নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন। পরে এইসব অস্ত্রই সন্ত্রাসবাদীরা ব্যবহার করে। পুলিশ তার বাড়ি থেকে একটা অবৈধ এ. কে. ৫৬ উদ্ধার করে। সঞ্জয় স্বীকার করতে বাধ্য হন এই বন্দুক আবু সালেমের কাছ তিনি পেয়েছেন। কিন্তু আবু সালেমের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অর্থ দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা। নাটের আসল গুরু তো দাউদই। কিন্তু না, দাউদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আদালতে প্রমাণিত হয়নি। মুম্বাই বিস্ফোরণে সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগও নয়। শুধু বেআইনি অস্ত্র রাখার অভিযোগে সঞ্জয়ের ছ'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। রায় ঘোষণার আগে আদালতের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য বলিউড চেষ্টার কসুর করেনি। করন জোহর, শাহরুখ খান, সলমান খান প্রত্যেকের এক সুর। সঞ্জয়কে নাকি ফাঁসানো হয়েছে। তিনি সরল, নিষ্পাপ। রায় ঘোষণার পর কেউ কেউ কেঁদেও ফেললেন। বলা হলো, সঞ্জয়কে অন্যায় শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা সরাসরি আদালতের বিরুদ্ধাচরণ করলেন।

এখন প্রশ্ন হলো, এই ধরনের একটি মানুষের বায়োপিক বানিয়ে পরিচালক রাজকুমার হিরানি কী বার্তা দিতে চেয়েছেন? খুঁটির জোর থাকলে যা খুশি করেও পার পাওয়া যায়, না কি, দেখুন, আমাদের দেশ কত নৃশংস— তাই এমন একজন আবেগপ্রবণ এবং দুঃখী মানুষকে শাস্তি দিতে পারল। দুটি উদ্দেশ্যই ভয়ংকর। নেতিবাচক। আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে কেরিয়ারের ইঁদুর দৌড়ে জিততে পারাই সব। কীভাবে জয় এল তা নিয়ে তাদের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। বলতে দ্বিধা নেই অভিভাবকেরাই তাদের এরকম উদাসীন এবং বেপরোয়া করে তুলেছে। সঞ্জয় দত্তের বায়োপিক তাদের এ ব্যাপারে উৎসাহ জোগাতে পারে। তাঁদের মনে হতে পারে, এটাই ঠিক। অন্তত সিনেমায় যখন দেখানো হচ্ছে। অন্যদিকে দেশকে নিষ্ঠুর প্রতিপন্ন করতে চাইলেও অনায়াসে কিছু মানুষকে দেশবিরোধী করে তোলা যায়। সঞ্জয় দত্ত যদি সূত্রধর হন, তা হলে ব্রেকিং ইন্ডিয়া নামক কর্মসূচির যারা ধারক এবং বাহক তাদের হাতই শক্ত হয়।

এই লেখার শুরুতেই লিখেছি, কালো এবং ধূসর চরিত্রদের নিয়ে বায়োপিক বানানোর রেওয়াজ নতুন নয়। রইস ছবিতে শাহরুখ খানের চরিত্রটি কুখ্যাত মাফিয়া আবদুল লতিফের আদলে তৈরি। ডি ডে-তে ঋষি কাপুর দাউদ ইব্রাহিম। রামগোপাল ভার্মার কোম্পানিতে অজয় দেবগণ আবু সালেম। আবার ওয়ানস আপন আ টাইম ইন মুম্বাইয়ে অজয় হয়েছেন দাউদ ইব্রাহিম। এছাড়া ব্ল্যাক ফ্রাইডে এবং স্পেশাল ২৬-এর মতো ছবি। এইসব ছবিতে মাফিয়াদের জাতে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। ভাবটা এরকম, এরা কেউই নিজের ইচ্ছায় মাফিয়া হয়নি। সামাজিক অন্যায়, অবিচার এবং অত্যাচারে খারাপ পথে যেতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ দোষ সমাজের। প্রশ্ন ওঠে, মাফিয়ারা সকলেই মুসলমান। সুতরাং, দোষ যদি কারোও হয়ে থাকে তা মুসলমান সমাজের। কিন্তু না, সেটি বললে চলবে না। সমাজ কথাটা ব্যবহার করতে হলে করতে হবে সামগ্রিক অর্থে। হিন্দুদেরও এর মধ্যে টানতে হবে। নয়তো মুসলমানদের প্রতি দরদ ঠিকমতো জমবে না। পাকিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যে ওভারসিজ রাইট বিক্রি করে মোটা অঙ্কের টাকাও আসবে না। আরবে ভারতীয় মুসলমানের কোনও সম্মান নেই। সেখানকার মানুষ হিন্দি ছবি দেখেন হিন্দু বিরোধিতার জন্য। এরপর আছে ব্রেকিং ইন্ডিয়ার অ্যাজেন্ডা। হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা যে এত মুসলমান ভক্ত তার প্রধান কারণ এই দুটো। লেখা, ছবি বা সিনেমা বিক্রি করা এবং দেশ ও দেশীয় সমাজকে দুর্বল করার বিনিময়ে পেট্রোডলার উপার্জন করা।

রাজকুমার হিরানিও তার ব্যতিক্রম নন। মুন্নাভাই এম বি বি এস ছবিতে তিনি সঞ্জয় দত্তকে গান্ধীগিরির তুলসীপাতা খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছিলেন। সঞ্জু ছবিতে তাকে প্রায় জাতেই তুলে দিলেন। উপকার করলেন আরও একজনের। তিনি রণবীর কাপুর। সঞ্জু ছবিতে তিনিই সঞ্জয়ের ভূমিকায়। অনেকদিন রণবীরের কোনও হিট ছবি নেই। ইন্ডাস্ট্রি থেকে প্রায় হারিয়েই যেতে বসেছিলেন। দিন কাটছিল প্রেম করে। দীপিকা পাড়ুকোন, ক্যাটরিনা কাইফ হয়ে এখন তিনি আলিয়া ভট্টের প্রেমিক। এক সাক্ষাৎকারে রণবীর স্বীকার করেছেন, একসময় তিনিও ড্রাগ নিতেন। একেবারে রাজযোটক মিল। তবে অভিনয় ভালো করেছেন। অবশেষে তার একটা হিল্লেও হয়েছে। এখন দেখা যাক এই মধুচন্দ্রিমা কতদিন স্থায়ী হয়।

এখন বায়োপিকের বাজার খুব চড়া। আশা করা যায় বলিউডে এরপরও অনেক বায়োপিক তৈরি হবে। হয়তো জাকির নায়েক বা হাফিজ সইদের জীবনও উঠে আসবে পর্দায়। আমরা বিস্ফারিত চোখে দেখব এবং বিশ্বাস করব, হ্যাঁ, এরা সত্যিই স্বেচ্ছায় এ পথে আসেননি। এদের বাধ্য করা হয়েছিল। তবে আমরা যাই বিশ্বাস করি না কেন, তাতে এই দেশটার কিছুই যায় আসে না। এ দেশের শেকড় আলগা করা অত সোজা নয়। রাজকুমার হিরানিরা হাজার বছর ধরে চেষ্টা করলেও পারবেন না। ■

রম্যরচনা

শিবের পাঁচালী

প্রণব দত্ত মজুমদার

শিবঠাকুরকে আমার বেশ লাগে। এক্কেবারে বিন্দাস! বেশ একটা ক্যাজুয়াল ডোন্ট কেয়ার ভাব! সাজপোশাক দেখ। এত বড় একজন দেবতা! জমকালো পোশাক পরতেই পারতেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু সবাই ঝলমলে পোশাক, ঝকঝকে গয়নাগাটি পরে থাকেন ব্যক্তিত্ব ধরে রাখার জন্য। আর আমাদের শিবঠাকুর! এইসব জবড়জং পোশাকের ধারই ধারেন না। শুধু লজ্জা নিবারণের জন্য গাছের ছালবাকল, ভালো জায়গায় যেতে হলে বড় জোর একটি ব্যাঘ্রচর্ম ব্যাস। গলায় দামি হারের বদলে জঙ্গল থেকে একটি মোটা সাপ তুলে নিয়ে জড়িয়ে নিলেন, হয়ে গেল। একদম সাদামাটা বেশ!

তিনি স্বর্গের উচ্চবর্গীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করেন না; অধঃপতিত নিম্নবর্গীয় ভুতপ্রেতদের সঙ্গে থাকতেই ভালোবাসেন। এলিটিজমের তোয়াক্কা না করে অতি সাধারণ নন্দী ভৃঙ্গির সঙ্গে গাঁজায় নিরাসক্ত নির্লোভ হয়ে শ্মশানেমশানে পড়ে থাকেন। এইজন্য অনেকে আড়ালে তাঁকে ভূতনাথ বলে ডাকে। তিনি তোয়াক্কা করেন না। এমন 'ডাউন-টু-দা আর্থ' দেবতা আর দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু ওই ভাবে চললেও ব্যক্তিত্ব দেখেছ! কোনো দেবতার সাহস হবে না তাঁর মুখের উপর কথা বলার। গাঁজা ভাঙ খান বটে; তবে তাঁর ক্যারেক্টার নিয়ে কেউ কথা বলতে পারবে না। প্রায় সব দেবতাদের মধ্যেই চরিত্রের অল্পবিস্তর

গোলমালের কথা শোনা যায়; কিন্তু শিবঠাকুরের চরিত্রের গোলমালের কথা শোনা যায় না।

ওরকম সাদামাটা থাকেন বটে, তাই বলে তাঁর গুণ কি কম? ফাইন আর্টসের একটি শাখায় তাঁর ধারে কাছে ত্রিভুবনে কেউ আছে? তাঁর নৃত্যকলার কথা বলছিলাম। নৃত্যকলায় তাঁর সমান বিশারদ ত্রিভুবনে আর কে আছে? তাঁর ওই বিখ্যাত 'নটরাজ' পোজটি তো সারা পৃথিবীর 'লেগো' হয়ে গেছে। আর তাঁর 'তাণ্ডব নৃত্য'? সেটার জন্য তো সঠিক 'স্টেজ' ই ত্রিভুবনে নেই। ওটা আরম্ভ করলেই ত্রিভুবন দুলতে আরম্ভ করে; দেবতারা দৌড়ে এসে বলেন বন্ধ কর বন্ধ কর মহাদেব তোমার ওই 'তাণ্ডব নৃত্য'। আর এতরকম যোগমুদ্রা? সেসব তো তাঁরই সৃষ্টি। 'যোগে'র ব্যাপারেও তাঁর ধারে কাছে কেউ নেই ত্রিভুবনে। বিষ্ণুদেব শুনেছি একটা যোগ ভালো করেন। তিনি 'যোগ-নিদ্রা' ভালো করেন, ওটাতে পরিশ্রম কম; আরাম বেশি।

এরকম চালচুলোহীন ভবঘুরের

মতো থাকলে কী হবে। স্বর্গমর্ত্যের মেয়েরা তাঁর জন্য একেবারে পাগল। তিনি ন্যাকা ন্যাকা সুন্দরী দেবকন্যাদের পাত্তাই দেন না। গিরিরাজ হিমালয়ের একমাত্র আদরের কন্যা, অপূর্ব সুন্দরী, ভয়ানক সাহসী দেবী দুর্গাকেও শিবঠাকুরকে পাওয়ার জন্য লজ্জাশরম ত্যাগ করে নাওয়া-খাওয়া ভুলে বহু বছর কঠিন তপস্যা করতে হয়েছিল।

গৃহিণী, ধনী গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা, বাপের দেওয়া হিমালয়ান সিংহের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ান। কর্তাটি কিন্তু নির্লোভ। তিনি ষাঁড়ে চড়েই তাঁর কাজ সারেন। তিনি চাইলে কী শ্বশুরমশাই বা তাঁর স্ত্রীকে বলে একটা হিমালয়ান সিংহ জোগাড় করতে পারতেন না? কিন্তু শ্বশুরমশাই বা স্ত্রীর কাছ থেকে জিনিস নিতে তাঁর বয়েই গেছে। তিনি ওসবের ধার ধারেন না। তিনি আপন গরিমায় চলেন। ছেলে মেয়েদেরও বেশি লাই দেননি। বড়োলোক শ্বশুর। গিন্নীকে বলেকয়ে ছেলেমেয়েদের চলাফেরার জন্য বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া কী জোগাড় করে দিতে পারতেন না? না, তিনি ওরকমটি করেননি। ছেলে মেয়েদের মা বড়লোকের বেটি— সিংহ চড়ে ঘুরে বেড়ান। ভোলানাথ কিন্তু ছেলে মেয়েদের দিলেন— একজনকে ইঁদুর, একজনকে পেঁচা, একজনকে

হাঁস, একজনকে ময়ূর। অতি সাধারণ বাহন। মা 'বি এম ডাব্লিউ' চরছেন তো ছেলেমেয়েরা লোকাল-মেড সাইকেল , অনেকটা সেইরকম ব্যাপার। ওতেই কাজ চালাতে হবে। বাপের যা ব্যাক্তিত্ব, ছেলেমেয়েরা মায়ের কাছে আব্দার করার সাহস পায়নি। ভোলানাথ একই বাড়িতে খাদ্য-খাদক সম্পর্কিত বাহনদের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন— বাহনরাও যাতে হিংসা দ্বেষ ভুলে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ভুলে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে, তাতে জীবজগতের মধ্যে প্রেমের ভাব সম্প্রসারিত হবে।

নিজে শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ালেও ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে তিনি 'প্লেন লিভিং হাই থিঙ্কিং' নীতিতে বিশ্বাসী। তাদের কী রকম বানিয়েছেন দেখ। কার্তিক হয়েছে বড় যোদ্ধা, দেব সেনাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছে। সারা জগতের ব্যবসায়ীদের রাশ গণেশের হাতে; ধানাই পানাই করেছ কী সব উল্টে দেবে। মেয়ে দুটি ডাকসাইটে সুন্দরী, মায়ের মতো! অনায়াসে বড় দেবতাদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু মেয়ে হলেও, ছেলেদের মতোই সমান ভাবে তৈরি করেছেন তাঁদের, কোনও ভেদাভেদ করেননি। সরস্বতী লেখাপড়া গান বাজনায় ওস্তাদ। সুতরাং সারা মর্ত্যের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বও অনায়াসে পেয়ে গেছেন। আর লক্ষ্মী। ইকোনমিক্সে তুখোড়। সুতরাং সারা মর্ত্যের অর্থদপ্তর তাঁর হাতে।

রূপবতী, গুণবতী, অসুরদলনী জাঁদরেল স্ত্রী দুর্গাদেবী কিন্তু ওরকম ভোলা ভালা স্বামীকে যথেষ্ট সমীহ করে চলেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বছরে একবার বাপের বাড়ি আসেন, কিন্তু স্বামীর কথা অমান্য করে তিনদিনের বেশি চারদিন থাকেন না। মা মেনকা কেঁদেকেটে ভাসালেও না, ঝড় জল বন্যা ভূমিকম্প হলেও না। ভোলানাথ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে গড়ে তুলেছেন খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর মিউচুয়াল রেসপেক্ট -এর এক নিবিড় সম্পর্ক। ■

এই সময়

খতম ১০০

চলতি বছরের প্রথম ছ'মাসে শতাধিক জঙ্গি নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। শহিদ হয়েছেন সেনাবাহিনীর ৪৩ জন

জওয়ান। জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হংসরাজ আহির। রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের লিখিত জবাবে তিনি একথা জানান।

শপথ

বিজেপির চারজন নতুন রাজ্যসভা-সাংসদ সম্প্রতি শপথ নিয়েছেন। এরা হলেন ইন্ডিয়ান

পলিসি ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর ড. রাকেশ সিনহা, মণিপুরি নৃত্যশিল্পী সোনাল মানসিংহ, ভাস্কর এবং কলাবিদ রঘুনাথ মহাপাত্র ও বিজেপির প্রাক্তন লোকসভা সাংসদ রাম শকল।

দশম

ভারত এবং এ এস ই এন গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ়

করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে সম্মেলন আয়োজন করার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিল ভারত। পরিভাষায় সম্মেলনটির নাম দিল্লি ডায়ালগ। এ বছর এর দশম বর্ষ।

সমাবেশ -সমাচার

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের রাষ্ট্রীয় বিচারবর্গ

গত ৬ থেকে ৮ জুলাই 'স্বদেশী জাগরণ মঞ্চে'র পূর্ব ক্ষেত্রের 'রাষ্ট্রীয় বিচার বর্গ' অনুষ্ঠিত হয় বীরভূম জেলার তারাপীঠের নিকট তারাপুর সরস্বতী শিশুমন্দিরে। বিচারবর্গে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, অসম এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্য থেকে মোট ২৪০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৭০ জন প্রতিনিধি ছিলেন। ৬ জুলাই বর্গের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংযোজক অরুণ ওঝা। ৮ জুলাই দুপুরে বর্গের সমাপ্তি হয়। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংগঠক কাশ্মীরিলালজী। এছাড়াও বর্গে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, বীরভূম বিভাগ প্রচারক

উত্তম মণ্ডল, বীরভূম বিভাগ সঙ্ঘচালক অশোক ঘোষ, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ প্রদীপ শর্মা, অখিল ভারতীয় সহ-বিচার প্রমুখ সতীশ কুমার, অখিল ভারতীয় সহ-সংযোজক ড. ধনপদ আগরওয়াল, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পূর্ব ক্ষেত্রের সংঘর্ষবাহিনী প্রমুখ বন্দেশংকর। বর্গে বিশেষ বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন পরিবেশবিদ ড. তুষার চক্রবর্তী। বর্গের বর্গাধিকারী ছিলেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পূর্ব ক্ষেত্রের সম্পর্ক প্রমুখ ঝাড়খন্ডের শচীন্দ্র বরিয়ালজী। তিন দিনে মোট ১০টি সত্র অনুষ্ঠিত হয়। সত্রগুলিতে পরিবর্তিত জিনযুক্ত শস্যের বিপদ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দ্বারা চাষে উৎপন্ন খাদ্যের জন্য পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও বাস্তুতন্ত্রের বিপদ, চীনা পণ্যের অনুপ্রবেশের জন্য জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতিসাধন, স্বদেশী অর্থনীতির ধারণা, স্বদেশী পরিবার ধারণা, স্বদেশী শিক্ষাব্যবস্থার এবং শিক্ষাব্যবস্থায় স্বদেশী ভাষার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া বক্তা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সত্রও বর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিন দিনব্যাপী বর্গে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ অতিথি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি দুধকুমার মণ্ডল, বর্তমান জেলা সম্পাদক আশিস ঘোষ, প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মুকুল রায়। বর্গের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন স্বদেশী জগরণ মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক সুব্রত মণ্ডল। বর্গ পরিচালনায় বিশেষ সহযোগিতা করেন শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য কৃপাসিন্ধু মণ্ডল।

হাওড়ার শিবপুরে ড. শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ

সম্প্রতি হাওড়ার শিবপুরে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্মারক সমিতি যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁকে স্মরণ করল। এই দিনের সভায় বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখার পূর্বতন সভাপতি অধ্যাপক অসীম ঘোষ, বিশিষ্ট বক্তা অধ্যাপক বিমল নন্দ, অমিতাভ দত্ত, আশিস রায় প্রমুখ শ্যামাপ্রসাদের জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশ নেন। শ্যামাপ্রসাদের

এই সময়

মহড়া

অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিভিন্ন দেশের বিমানবাহিনীর জওয়ানদের

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। এর পোশাকি নাম পিচ ব্ল্যাক (পিবি-১৮)। প্রদর্শনীর অন্তর্গত ড্রিল এবং মহড়ায় অংশ নেবে ভারত। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করাই এর লক্ষ্য।

দাওয়াই

অর্থনৈতিক অপরাধ এবং অপরাধীদের শায়েস্তা করতে কড়া বিল আনল কেন্দ্রীয়

সরকার। বিলটির নাম দা ফিউজিটিভ ইকোনমিক অফেনডারস বিল ২০১৮। এই বিল আইনে পরিণত হলে, আর্থিক অপরাধ করে দেশ ছেড়ে পালানো অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা সহজ হবে।

হুমকি

হয় ইসলাম কবুল করো, নয়তো মরো। ঠিক এই ভাষাতেই চিঠি লিখে বাংলাদেশের

কক্সবাজার অঞ্চলের হিন্দুদের হুমকি দিচ্ছে আই এস জঙ্গিরা। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে তারা ত্রুটি রাখছে না। প্রাণভয়ে দিন কাটছে মানুষের।

সমাবেশ -সমাচার

ওপর যে অন্যায় সাম্প্রদায়িক তকমা দাগিয়ে দেওয়া হয় তা যুক্তিপূর্ণভাবে খণ্ডন করেন অধ্যাপক ঘোষ। অধ্যাপক নন্দ যথার্থভাবেই শ্যামাপ্রসাদের রাষ্ট্রনেতা ও এক দুরদর্শী শিক্ষাবিদ হওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন। দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্ব গত শতাব্দীর ৩০ ও ৪০-এর দশকে যখন মুসলিম লিগ তোষণে ব্যস্ত থেকে অনায়াসে বাংলা তথা দেশভাগের হঠকারী সিদ্ধান্ত নেন,

তখন শ্যামাপ্রসাদ তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য হয়ে থাকার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে জোর করেই হিন্দু হিতে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই প্রসঙ্গ তোলেন অধ্যাপক ঘোষ। এদিন শ্যামাপ্রসাদের নজরুলকে লেখা একটি চিঠি ও তাঁর মৃত্যুর পর যোগমায়া দেবীর জওহরলাল নেহরুকে লেখা চাঞ্চল্যকর চিঠির প্রতিলিপি সংস্থার তরফে পাঠ করেন হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। শুরুতে,সুকণ্ঠের অধিকারী দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্দে মাতরম অনুষ্ঠানের সুর বেঁধে দেয়। শ্যামাপ্রসাদের মতো আত্মবলিদান দেওয়া দেশপ্রেমিকের দীর্ঘদিন অপ্রাপ্য মর্যাদার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু হয়েছে। সংস্থার কর্ণধার রথীন ব্যানার্জি ও উদ্যমী তরুণ মানস নাগের প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান শ্যামাপ্রসাদকে বুঝতে সাহায্য করবে।

কলকাতায় প্রবাসী রাজস্থানি সম্মেলন

গত ১৫ জুলাই কলকাতার রাজস্থান পরিষদের উদ্যোগে অসোয়াল ভবনে প্রবাসী রাজস্থানি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী অরুণ তিওয়ারি। গণেশ বন্দনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত

বক্তব্য রাখেন শিল্পপতি বনোয়ারিলাল মিত্তল। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় খাদ্যপ্রতিমন্ত্রী সি আর চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথিরূপে রাজস্থান সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কালীচরণ সরাফ। প্রথমেই মঞ্চস্থ অতিথিদের বরণ করে নেন মোহনলাল পারীক, দামোদর প্রসাদ বিদাওয়তকা, অনিল পোদ্দার, ভগীরথ চাণ্ডক, কিশন ঝাঁওয়ার, ভগীরথ সারস্বত প্রমুখ। সম্মেলন পরিচালনা করেন রাজস্থান পরিষদের অধ্যক্ষ শার্দুল সিংহ জৈন। কলকাতা ও হাওড়ার বহু প্রবাসী রাজস্থানী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়

ঘুষ

কংগ্রেসের বায়নাক্কা সামলাতে গিয়ে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এইচ.ডি কুমারস্বামী

জেরবার। কিছুদিন আগেই কান্নাকাটি করেছেন। সেইজন্যেই সম্ভবত দামি উপহার দিয়ে সামাল দিতে চাইছেন। উপহারের মধ্যে রয়েছে এক লক্ষ টাকা দামের অ্যাপেল আই ফোনও। বিজেপি সাংসদ রাজীব চন্দ্রশেখর জানিয়েছেন এই তথ্য।

নকশাল দমন

নিরাপত্তারক্ষীদের সংঘর্ষে সাতজন নকশাল জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল

দান্তেওয়াড়ার তিমেনারের জঙ্গল এলাকা। এই অভিযানের দায়িত্বে ছিলেন জেলা রিজার্ভ গার্ড এবং স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের জওয়ানরা। জঙ্গিদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে।

মাছ বন্ধ

মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পারিকর ১৫ দিনের জন্য রাজ্যে মাছ আমদানি বন্ধ রাখার নির্দেশ

দিয়েছেন। সম্প্রতি মাছ দীর্ঘসময় তাজা রাখার জন্য ফর্মালিনের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ফর্মালিন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

সমাবেশ -সমাচার

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শিলিগুড়ি শাখার পরিচালনায় গত ১ জুলাই বিনামূল্যে এক চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সুভাষপল্লী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে আয়োজিত এই শিবিরে উদ্বোধন করেন ডাঃ মানস চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সুনীলকুমার সিংহ এবং ডাঃ লোপামুদ্রা মজুমদার। শিবিরে প্রায় দু'শোজনের চোখ পরীক্ষা

করা হয়। এছাড়াও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষ থেকে বেশ কিছু দুঃস্থ মানুষদের চোখ অপারেশন ও তাদের চশমার দায়িত্ব নেওয়া হয়। এদিনের শিবিরে স্বামী ধর্মাত্মানন্দজী ও স্বামী অতীশানন্দজী মহারাজ এবং শহরের গণমান্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম মহোৎসব উদ্‌যাপন

বি.এম.এস. অনুমোদিত বরিষ্ঠ নাগরিক পরিসঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটের উদ্যোগে গত ৬ জুলাই দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের (আদ্যাপীঠে)-এর প্রেক্ষাগৃহে ভারতমাতার বরেণ্য সন্তান ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীকুমার চক্রবর্তী প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরম সংগীত ও দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন দূরদর্শন শিল্পী কুমারী কৃষ্ণা দাস। অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পরিসঙ্ঘের প্রধান উপদেষ্টা শ্যামল কুমার হাটি, পরিসঙ্ঘের সভাপতি দীপঙ্কর মুখার্জি (অ্যাডভোকেট), সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দে, সহসভাপতি দিলীপ পাল ও বাংলাদেশ থেকে আগত প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক সুধীর চৌধুরী।

ড. শ্যামাপ্রসাদের জীবন ও দর্শন নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন শ্যামল কুমার হাতি ও সুধীর কুমার চৌধুরী। তারপর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বঙ্গবাসী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অরূপ রঞ্জন প্রধান ও পরে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী উমাশংকর চক্রবর্তী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন ও দর্শন নিয়ে মনোমুগ্ধকর ও সবিস্তার আলোচনা করেন যা শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করে। যোগব্যায়াম প্রদর্শন করেন পরিসঙ্ঘের কোষাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ বসু ও পার্থ রায়।

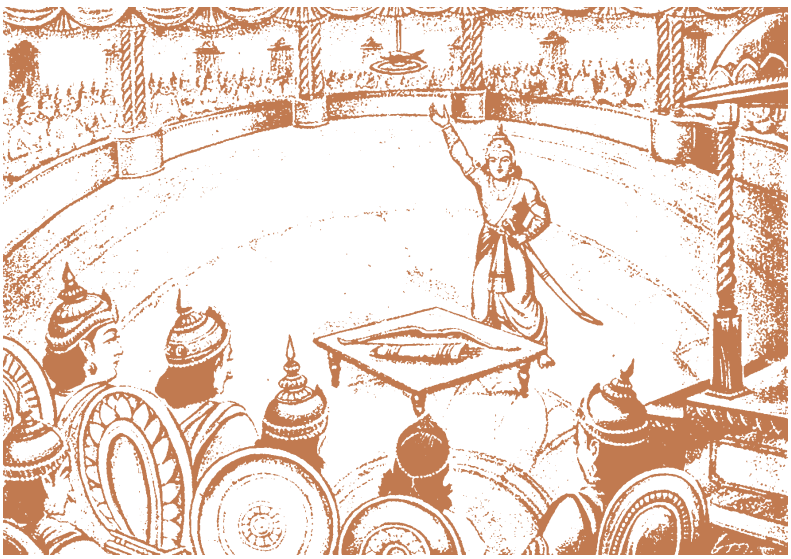

মহাভারতের চরিত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন

দেবপ্রসাদ মজুমদার

মহাভারতের এক অভিনব বৈপরীত্যপূর্ণ চরিত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন। যজ্ঞবেদী থেকে উত্থিত অযোনিসম্ভবা কোনও পুরুষ এমন ক্রোধী, ঈর্ষাপরায়ণ, যুদ্ধবাজ, নৃশংস, নীতিজ্ঞানহীন হয় ও জীবনের শেষে নৃশংস পরিণতি লাভ করে তা ধৃষ্টদ্যুম্ন চরিত্র না বিশ্লেষণ করলে জানা সম্ভব নয়। বন্ধু দ্রোণের শিষ্যদের কাছে পরাজিত হয়ে, অর্ধরাজ্য বিসর্জন দিয়ে বন্ধুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে অপমানিত ক্ষুব্ধ রাজা দ্রুপদ দ্রোণবধার্থে পুত্রকাঙ্ক্ষী হয়ে পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। আর সেই পবিত্র যজ্ঞাগ্নি থেকে উত্থিত হলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। মহাভারতের আদিপর্বে ও দ্রোণপর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহাভারতকার বলেছেন— ধৃষ্টদ্যুম্নের গাত্রবর্ণ আগুনের মতো, তিনি অগ্নিবর্ণ, রথে আরোহণ করেই তিনি যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূত হলেন। কিরীট, বর্ম, ধনুর্বাণ ও রথ তাঁর সহজাত অলংকার। তাঁর আকৃতি বীরত্বব্যঞ্জক, তিনি সুপুরুষ ও মনোহরকান্তি।

যজ্ঞাগ্নি থেকে ওই মহান বীরপুরুষের আবির্ভাবে আনন্দিতা হয়ে দ্রুপদ পত্নী ঋত্বিক যাজের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, এই যজ্ঞাগ্নি উত্থিত পুরুষ যেন তাঁকে জননী বলে জানে, ঋত্বিকও কোনও প্রকার দ্বিধা না করে 'তথাস্তু' বলে বর দিলেন।

মহাভারতের আদি পর্বে 'ধৃষ্টদ্যুম্ন' নামের ব্যুৎপত্তিও প্রদর্শিত হয়েছে। ধৃষ্টদ্যুম্নের আবির্ভাবের পরে ব্রাহ্মণেরা বললেন— 'ধৃষ্ট' অর্থাৎ প্রগলভ, বীর, অমর্ষী অর্থাৎ শত্রুর উৎকর্ষে অসহনশীল, দ্যুম্ন অর্থাৎ সহজাত বিত্ত কিরীট, বর্ম প্রভৃতি যিনি ধৃষ্ট এবং দুম্নাদিবিশিষ্ট হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে পরিচিত হবেন।

দ্রোণবধের নিমিত্ত যে ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম, একথা জেনেও বন্ধু দ্রুপদের বন্ধুত্ব স্বীকার করে আচার্য দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজের গৃহে এনে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, আচার্য হিসাবে এখানেই দ্রোণের শ্রেষ্ঠত্ব ও উদারতা।

এরপর ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায়, সেখানে ধৃষ্টদ্যুম্নই উপস্থিত দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী সমস্ত রাজন্যবর্গকে লক্ষ্যভেদের বিষয় জানাচ্ছেন এবং কৃষ্ণার সঙ্গে সমস্ত রাজন্যবর্গের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। লক্ষ্যভেদের পর দ্রৌপদী যখন ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণদের বরমাল্য প্রদান করলেন, তখন রাজা দ্রুপদ

অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন। কিন্তু ওই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের আসল পরিচয় জানবার জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নই গোপনে কুম্ভকারের গৃহে গিয়ে পাণ্ডবদের যথার্থ পরিচয় জানতে পারেন ও রাজা দ্রুপদকে তা জানিয়ে তাঁকে তৃপ্ত করেন। এরপর সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আমরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে উপস্থিত দেখতে পাই। এরপর বহু ঘটনার পর বিরাট পর্বে তাঁর উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর বিবাহ উৎসবে বিরাট নগরে তাঁর উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। আর তৎসঙ্গে ওই স্থানে পাণ্ডবদের ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে যে পরামর্শ সভা বসেছিল, তাতে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

ভারতযুদ্ধের প্রাক্কালে ও যুদ্ধের সূচনা ও উদ্যোগ পর্ব থেকেই আমরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখি। উদ্যোগ পর্বে দেখি, মন্ত্রী সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের দূত হয়ে উপপ্লব্য নগরী থেকে হস্তিনাপুরে ফিরলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছেন পাণ্ডব পক্ষের উপস্থিত বীরগণের বিস্তৃত সংবাদ। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন সম্বন্ধে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন— ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্বদাই পাণ্ডবদের যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করছেন। তিনি বার বার বলছেন— হে ভারতশ্রেষ্ঠগণ, যুদ্ধের জন্য ভয় পেও না, যুদ্ধ কর। দুর্যোধনের পক্ষে যে সকল বীর যোগ দিয়েছেন, আমি তাদের সকলকেই বধ করব। বেলাভূমি যেমন সমুদ্রকে নিরোধ করে, আমিও সেইরূপ ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ বীরগণকে করব।" সঞ্জয় বর্ণনা দিচ্ছেন— ধৃষ্টদ্যুম্নের বীরত্বপূর্ণ কথা শুনে যুধিষ্ঠির তাঁকে বলছেন— 'হে বীরশ্রেষ্ঠ, হে মহাবাহো, তুমি একাই কৌরবগণকে নিগ্রহ করতে সমর্থ। আসন্ন এই ঘোর সংগ্রামে তুমিই আমাদের প্রধান

সহায়, তোমার মতো তেজস্বী পুরুষ আমার সহায় থাকতে ভয় কী?" ধৃষ্টদ্যুম্ন সঞ্জয়কে বলেছিলেন— ''হে সূত, হস্তিনায় গিয়ে সকলকেই বলবে যে, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে শত্রুতার ফল শুভ হবে না। পৃথিবীতে অর্জুনের সমান বীরপুরুষ আর কেউ নেই, তাঁকে জয় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। অতএব কেউ যেন যুদ্ধের বিষয় চিন্তাও না করেন।" এখানে ধৃষ্টদ্যুম্নের অহমিকা প্রকাশ পেয়েছে তবে তৎসঙ্গে তিনি যে ক্ষত্রিয় বীর ও তেজস্বী তা অস্বীকার করলে চলবে না। আর যুধিষ্ঠির যথার্থ ভাবেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে তাঁদের প্রধান সহায় হিসাবে নির্ণয় করেছেন। কারণ পরবর্তীকালে পাণ্ডব পক্ষের প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করবার কালে সাতজন সেনাপতির মধ্যে কাকে প্রধান সেনাপতি করা হবে সে বিষয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও বেশিরভাগ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রধান সেনাপতি পদে নির্বাচনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নের শ্রেণীত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন— ''ক্ষিপ্রহস্ত, নানাবিধ যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ, অভেদ্য কবচ, শ্রীমান এই ধৃষ্টদ্যুম্নকে যূথপতি মাতঙ্গের ন্যায় আমাদের প্রধান সেনাপতি হবার যোগ্য বলে মনে করি।' শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সমর্থন করে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন— 'হে শত্রুনাশন, আমিও ধৃষ্টদ্যুম্নকেই প্রধান সেনাপতি করতে চাই।' উদ্যোগ পর্বে আমরা পূর্বেই জেনেছি যে ধৃষ্টদ্যুম্ন এক অক্ষৌহিনী সেনার অধিপতি ছিলেন আর এখন প্রধান সেনাপতি পদে বৃত হলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের বর্ণনা দিয়ে মহাভারতকার বলেছেন— ''ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের অশ্বগুলোর রং ছিল পারাবতের বর্ণের মত, আর অশ্বগুলো অত্যন্ত বেগবান, স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত।"

মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার দশ দিনে ভীষ্মের পতন ঘটেছে। যুদ্ধের প্রথম থেকেই ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতান্ত যমের মতো কৌরব সৈন্য ও বীরদের সংহার করে চলেছেন। যুদ্ধের একাদশ দিন থেকে পঞ্চদশ দিন পর্যন্ত দ্রোণাচার্য কৌরবদের সেনাপতি ছিলেন। তিনি অশেষ পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করেছেন। কোনওভাবে দ্রোণাচার্যকে প্রতিরোধ করতে না পেরে যুধিষ্ঠিরের দ্বারা 'অশ্বত্থামা হত' এই কথা বলিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্রোণাচার্যকে অস্ত্রত্যাগ করতে বাধ্য করেন। নিজ পুত্রের মৃত্যুসংবাদ সত্যবাদী প্রিয় শিষ্য যুধিষ্ঠিরের মুখে শুনে ও পূর্বে উপদৃষ্ট ব্যাস, বিশ্বামিত্র, বালখিল্য প্রভৃতি ঋষিদের উপদেশে মৃত্যু আসন্ন জেনে তিনি যোগ অবলম্বন করে দেহত্যাগ করেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের দেহত্যাগের বিষয় বুঝতে না পেরে আচার্যের চুল ধরে তাঁর শিরচ্ছেদ করেন ও সিংহনাদ করতে থাকেন। এতে উভয় পক্ষের বীরগণ সকলেই তাঁকে ধিক্কার দিতে থাকেন। কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্য করেননি। পাণ্ডবদের এই ছল চাতুরি ও পিতার এরূপ নৃশংস মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে অশ্বত্থামা ক্রোধে জ্বলে ওঠেন ও প্রতিজ্ঞা করেন ''মৃদু উপায়েই হোক আর নৃশংস উপায়েই হোক তিনি পাপকারী ধৃষ্টদ্যুম্নকে যে কোনও উপায়েই যুদ্ধে হত্যা করবেন।' অশ্বত্থামার এমন প্রতিজ্ঞায় কৌরব পক্ষে উল্লাস শুরু হলো এবং এদিকে যুধিষ্ঠির চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আচার্য দ্রোণের মৃত্যুতে পাণ্ডবেরা বিশেষ দুঃখিত হলেন, অর্জুন অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন, অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নের আচরণে তাঁকে তিরস্কার করতে লাগলেন, এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন আচার্য দ্রোণের অধম ব্রাহ্মণত্ব বর্ণনা করে নিজে শ্লাঘা অনুভব করে অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বললেন— ''আচার্যের শিরচ্ছেদ করেও আমার তৃপ্তি হয়নি। তিনি ব্রাহ্মণও নন, ক্ষত্রিয়ও নন। ওই নৃশংস পুরুষ শুধুই আমার জাতিবর্গকে নিধন করছিলেন। জয়দ্রথের শিরের ন্যায় তাঁর শিরকে আমি যে নিষাদ পল্লীতে নিক্ষেপ করতে পারিনি— সেটাই আমার দুঃখ। তাঁর সঙ্গে আমার শত্রুতা কুলক্রমাগত, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব মিথ্যাবাদী নয়, আর আমিও অধার্মিক নই, শিষ্যদ্রোহী পাষণ্ডকে নিধন করেছি" ইত্যাদি। ধৃষ্টদ্যুম্নের এহেন কুরুচিপূর্ণ অনৈতিক কথায় কৃষ্ণ, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতিরা লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকলেন। এই সময় সাত্যকি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বহু কটু বাক্য বলতে শুরু করলেন। অবশেষে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হলে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় তা নিবারিত হলো।

ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্রোধী, উগ্র ও প্রতিহিংসা পরায়ণ। অর্জুনের মতো বীরকেও তিনি কটুক্তি করতে দ্বিধা করেননি। যুদ্ধের শেষ দিনে গভীর রাত্রিতে অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে প্রথমেই ঘুমন্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে লাথি মেরে জাগান, তারপর চুল ধরে টেনে তাঁর গলায় বুকে পা দিয়ে চেপে বার বার লাথি মারতে মারতে তাঁর প্রাণ সংহার করেন। অশ্বত্থামা যখন তাঁর গলায় ও বুকে পা দিয়ে চেপে ধরেছিলেন— তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন বলেছিলেন— 'আচার্যপুত্র, শীঘ্র অস্ত্রদ্বারা আমাকে হত্যা কর, হে নরশ্রেষ্ঠ, তোমার কৃপায় আমি যেন বীরের গতি লাভ করি।" প্রত্যুত্তরে অশ্বত্থামা বললেন— হে দুর্মতি, কুলাধম, আচার্যঘাতিগণের উত্তম লোকে গতি হয় না, অতএব তুমি শস্ত্রের দ্বারা নিহত হওয়ার যোগ্য নও। ধৃষ্টদ্যুম্নের স্ত্রীপুত্রের সবিশেষ পরিচয় মহাভারতকার দেননি। তবে তাঁর তিন আত্মজের উল্লেখ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র :

১। মহাভারত—শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
২। মহাভারত—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
৩। মহাভারত—আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ।
৪। মহাভারতের চরিত্রাবলী---সুখময় ভট্টাচার্য।
৫। পৌরাণিক—অমল মুখোপাধ্যায়।
৬। অন্যান্য সাময়িক পত্র-পত্রিকা সমূহ।

পৌরাণিক কিরাত দেশ

গোপাল চক্রবর্তী

পৌরাণিক নগরগুলির মধ্যে কিরাতগোষ্ঠী ও কিরাতদেশ উল্লেখযোগ্য। হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীদেরই বিশেষ ভাবে 'কিরাত' বলা হতো। ব্রহ্মপুত্রবিধৌত অঞ্চল, ভোটদেশের কতকাংশ, পূর্ব নেপাল ও ত্রিপুরা রাজ্য মুখ্যত 'কিরাত দেশ' বলে অভিহিত হতো।

কিরাতদের অস্তিত্বের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় যজুর্বেদে। বাজেসনেয়িসংহিতা (৩০.১৬) এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এদের 'পার্বত্যগুহাবাসী' বলা হয়েছে। মহাভারতের কোনও কোনও পর্বে কিরাতগণকে 'হিমবৎদুর্গনিলয়া' বলা হয়েছে। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন বিদেহ রাজ্য অতিক্রম করে পূর্বাঞ্চলে সাতটি কিরাত রাজ্যের রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। মহাভারতের সভাপর্বে কিরাতগণ ভীষণ ও নিষ্ঠুর বলে বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধে ও শিকারে তাদের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। সুশ্রী ও গৌরবর্ণ কিরাতগণ পশুচর্ম পরিধান করত এবং তাদের মাথার জটা ত্রিকোণাকার চূড়া করে বাঁধা থাকত।

কিরাতগণ ভারতের প্রাচীনতম আদিবাসীদের অন্যতম জাতি। কিরাতগণ মঙ্গোলীয় বা পীতজাতি থেকে উদ্ভুত বলে অনুমান করা হয়। বিশেষত চীনা ও ভোটজাতির আকৃতিগত লক্ষণাদির সঙ্গে এদের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতে কিরাত বলতে সাধারণত অসভ্য বন্য পার্বত্য উপজাতি বোঝায়, কিন্তু এরা অস্টিক ভাষাভাষী কোল, শবর প্রভৃতি মধ্যভারতীয় আদিবাসীদের থেকে পৃথক।

ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর কিরাত জাতি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয় এবং ক্রমে হিমালয়ের পূর্বে ও উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ক্রমশ তাদের স্বাভাবিক সাহস ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা সমভূমির আর্যদের দ্বারাও সমাদৃত হতে থাকে। প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভৌমবংশীয় রাজা ভগদত্ত চীন ও কিরাতবাহিনী পরিবৃত্ত হয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব পক্ষে তুমুল সংগ্রাম করেছিলেন (মহাভারত সভাপর্ব ২৬.৯)। ক্রমে তাদের সামাজিক মর্যাদাও বাড়তে থাকে। স্মৃতিকার মনু কিরাতদের ব্রাত্য বা বৃষল ক্ষত্রিয় হিসাবে ব্রাহ্মণ্য সামাজিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন (মনুসংহিতা-১০.৪৪)। মনুস্মৃতির ভাষ্যকার মেধাতিথি কিরাতদের নিম্নশ্রেণীর ক্ষত্রিয় বলে বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতেও কিরাতদের সম্পর্কে বহু তথ্যাদি পাওয়া যায়।

টলেমি ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ওক্সস নদীর উপকূলস্থ অপর একাকির্হাদার-এর কথা বলেছেন। দিওনিসিআকার বর্ণনাতেও উরসায় (আধুনিক হাজারা জেলা) বসবাসকারী আস্‌পাসিয় উপজাতির পার্শ্ববর্তী কির্হাদাইদের উল্লেখ করেছেন। এরা পশুচর্মের নৌকা ব্যবহার করত। সম্ভবত পার্বত্য কিরাতজাতির একটি শাখা ওই অঞ্চলে বসবাস করত।

কিরাত জনগোষ্ঠী ক্রমে ভারতের নানা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক যুগের শিলালিপিতেও কিরাতদের উল্লেখ আছে। নাগার্জুনীকোণ্ডা শিলালিপিতে বর্ণিত আছে যে শ্রীশৈলবিহারে যে সব বৌদ্ধ শ্রমণ আসতেন 'চিলাত' তাঁদের অন্যতম। 'চিলাত' কিরাত শব্দেরই প্রাকৃত রূপ। সাঁচির বৌদ্ধস্তূপের প্রস্তর বেষ্টনীর উপরেও 'চিরাতীয়' (কিরাতীয়) উপাসকের নাম উল্লেখ আছে। খ্রিস্টিয় নবম শতাব্দীর গুর্জর-প্রতিহার নৃপতি ২য় নাগভট্টের গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে অপরাপর জাতির সঙ্গে কিরাত জাতিও তাঁর দ্বারা বিজিত হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। প্রাচীন গঙ্গরা ২য় মারসিংহের আনুমানিক দশম শতকের শ্রবণবেলগোলা শিলালিপিতে বিন্ধ্যপর্বতবাসী এক কিরাত উপজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্বে কিরাতরূপী শিবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধের কাহিনি এবং পরবর্তীকালে সেই কাহিনি নিয়ে রচিত ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়ম্' কাব্য আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারতবাসীর কাছে 'কিরাত' জাতিকে পরিচিত করে তুলেছে। নেপালের পূর্বাঞ্চলে 'কিরাত' নামে মঙ্গোলীয় একটি জাতির বসবাস আছে। অনেক গবেষক এদের 'কিরাত' জাতির বংশধর মনে করেন। পৌরাণিক কিরাত দেশের অস্তিত্ব আজ আর নেই, কিন্তু কিরাত জাতির লোকেরা ভারতের অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে। ▮

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

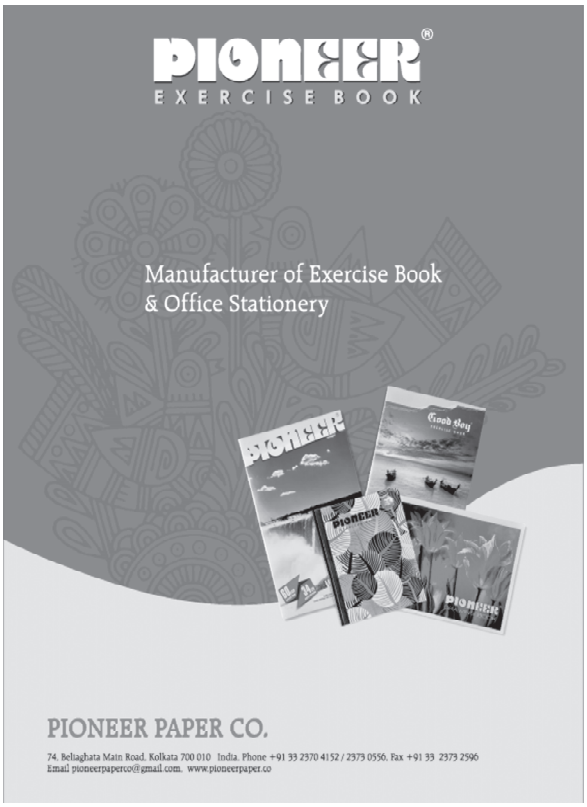

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

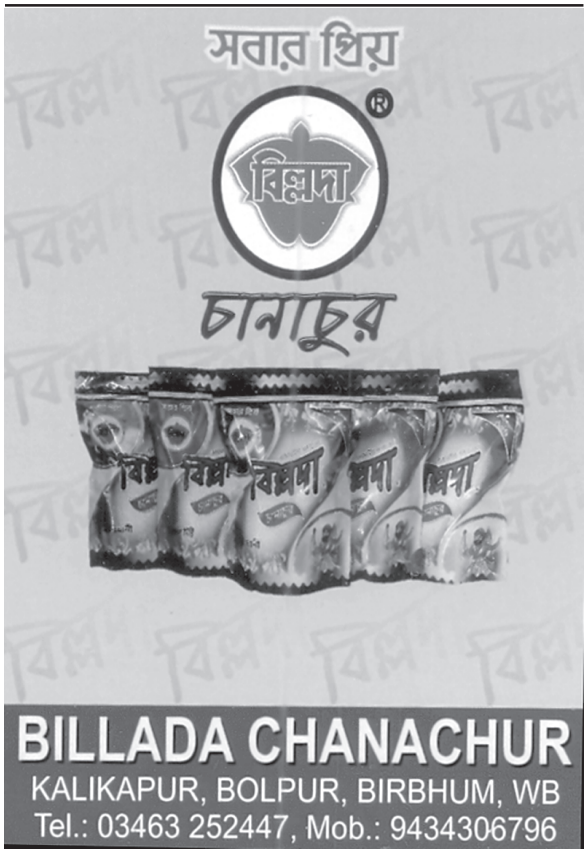

গেরুয়া আলোর পথ

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আহা, অমন দুঁদে পুলিশ অফিসার, কিন্তু দেখাচ্ছিল ঠিক প্রফেসার হিজিবিজবিজের মতন!

—হিজিবিজবিজ...হুম্‌ম্‌। কিন্তু তিনি আবার প্রফেসার হলেন কবে?

—আঃহা, সুকুমার রায়ের লেখা কেন ভাবছ? গোপালপুরে সমুদ্রের ধারে সন্ধ্যেবেলা প্রফেসার হিজিবিজবিজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের একটা খুব অদ্ভুত গল্পে...সেই আমাদের ছোটবেলায়, প্রথম দিকের শারদীয় আনন্দমেলার কোনটায়, তা মনে নেই, কিন্তু ছবিটা স্পষ্ট চোখে ভাসছে...

শ্রোতার চোখদুটো, অদ্ভুত রসের ধাক্কায় আরও গোল গোল হয়ে যাচ্ছে দেখে, রূপম হেসে উঠে বলল, আরে হিজিবিজবিজকে তো সব্বাই চেনে, কিন্তু ফ্র্যান্সিসকে জানে ক-জন? এই আমার মতন কেউ কেউ, যারা ছোটোবেলায় শুকতারা পড়ত, তারাও দেখি ঠিকঠাক মনে করতে পারছে না...তাই সোনার ঘণ্টা নিয়ে তার অ্যাডভেঞ্চারের গল্প মনে নেই! অবশ্য আমিও তখন একটু বড় হয়ে গেছি। অরুণ-বরুণ-কিরণমালা কিংবা মিতুল নামে পুতুলটি থেকে পিছিয়ে গেছি ঠাকুরমার ঝুলির গল্পে, লালকমল-নীলকমল...

ডানহাতটি প্রসারিত করেছে শ্রোতা, রূপম ভাবল, বুঝি বড় হওয়ার সঙ্গে পিছিয়ে যাওয়ার সম্পর্কটা বুঝতে পারছে না বলে একটু থামতে বলছে। কাজেই, থেমে থেমেই সে বোঝাতে থাকে, আহা, বড় হতে হতে যে মনে মনে আমরা ছোটোবেলাতেই পিছিয়ে যাই—বড়বেলায় যে, রূপকথাগুলো পড়ি, যেমন ধরো আমাদের বেলায় হ্যারিপটার, পড়তে পড়তে কি বোঝা যায় না যে সমস্ত গল্পই ঘুরে ফিরে একইরকম? সেই নানারকম চেহারার রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই, জার্নির শেষে প্রাণভোমরা উদ্ধার...

প্রসারিত হাতটি সোজা বাড়িয়ে শ্রোতা টেবিল চাপড়াতে থাকল। এই শরীরী ভঙ্গি রূপম চেনে, কিন্তু যে আবেশে, রূপকথার প্রাণভোমরার ব্যাখ্যা সে দিতে চাইছে, তাতে শ্রোতার আপত্তিটুকু পাছে সে না বোঝে, তাই বলেই ফেলল, হচ্ছিল পুলিশ অফিসারের কথা...

—আহা, স্ট্রেট লাইনেই তো ফিরছি। কিন্তু জীবনের গল্পগুলো কি অতই সোজা?

রাজকন্যা, অর্ধেক রাজত্ব, তারপর তারা সুখে

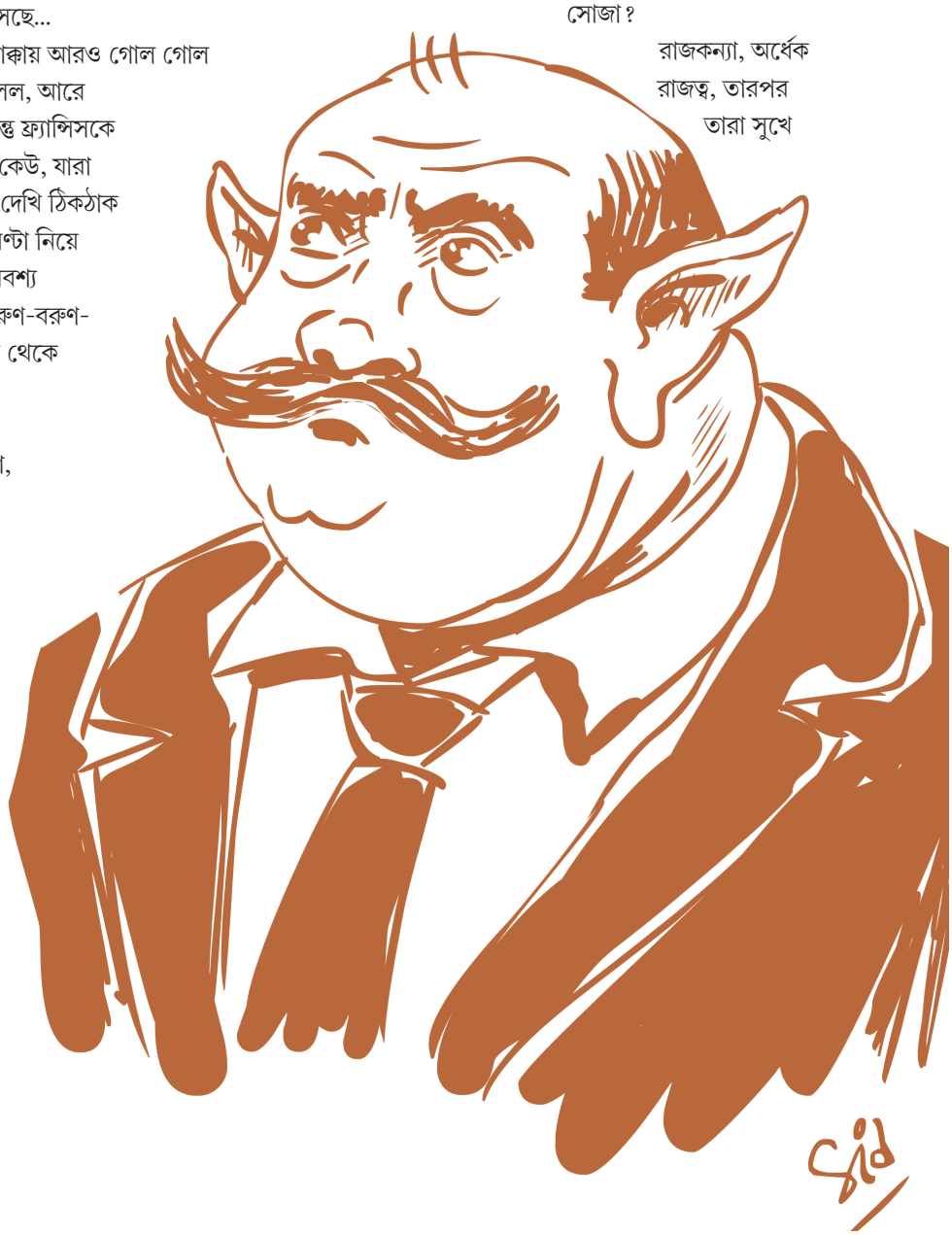

দিনাতিপাত করতে থাকল, ঠিক অমন কথাও হয় কি? বরং, ওই বিয়ে করার পরই যে গল্প আসলে শুরু... তো, দিব্যি আড্ডা দিচ্ছিলাম বিয়েবাড়িতে, ওপরের হলঘরটায়, আমার পছন্দের লোকজনের সঙ্গে, তখনই একবার আমার মেয়ে এসে বলল, নীচে এসো, কত দিদা-দিদারা এসেছেন— কী করছ ওপরে এতক্ষণ ধরে...আর ঠিক তারপরই তো আমার গল্পের ঘটনাটা শুরু। অত সৌজন্যমূলক আলাপ-টালাপ আর কত পোষায়? যজ্ঞের ধোঁয়াতে তখন সব্বার চোখ জ্বালা করছে। তখনই দেখলাম সেই ভদ্রলোককে, আমার বউয়ের দিকে আত্মীয়, বিরাট পুলিশ অফিসার ছিলেন, কিন্তু কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেছেন এখন। বয়েস তো আশি পেরিয়েছে অনেকদিন! সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং, মুখের নীচের দিকটা, মানে থুতনি আর গালের ওখানটা, দেখাচ্ছে ঠিক বয়স্কা ভদ্রমহিলাদের মতন—

—ইয়েস। রাইট। অমন হয়, ওটা কমন।

—গোঁফটা কিন্তু আমার মতন। মানে কমবয়েস থেকে পাকা, আর বেশ পালোয়ানি স্টাইল, সেই টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে আখ চিবিয়ে ভাঙা দেহাতি পুরুষটির ধরনে।

—কিন্তু, আসলে হিজিবিজবিজ।

—সেটা বোধহয় কানদুটোর জন্য। শরীরটা ঝুঁকেও গেছে একটু। তাঁর মিসেসের কিন্তু দারুণ দাপট, চেহারাও দিব্যি আগের মতনই গোলগাল—

—দেখলাম তো। প্লেটে করে খাবার এনে দিলাম...

—হ্যাঁ, ওই গ্রুপের মধ্যে সকলেই চলৎশক্তিহীন, কোনওরকমে হাত ধরে ধরে...

—তুমি কি ওই ভদ্রলোককে মিন করছ, প্লেটে অনেক মাংস নিয়ে বসেছিলেন?

—নাড়াচাড়া করছিলেন। খাচ্ছিলেন না কিন্তু!

—দ্যাখো কাণ্ড। অথচ একটা সময়ে কী প্রচণ্ড দাপটে রাজত্ব করেছেন...

কথার মুখ ঘুরে যায় অনেকদিন আগের এক বিয়েবাড়ির স্মৃতিতে। রূপমেরও দুর্দান্ত অভিজ্ঞতার দিন সেটা। আলিপুর এলাকায় বিশাল বাংলোর উদ্যানে বাঘা বাঘা আই পি এস অফিসাররা তো ছিলেনই— কাগজে যাদের নাম দেখা যায় রোজ। কিন্তু মুখোমুখি মৃদু হাসি জ্যোতি বসু, ভাবা যায়? আহা, মুঠোফোনে ছবি তোলাতুলির ফ্যাশন কেন যে সে আমলে ছিল না!

রূপম মনে মনে পৌঁছে যায় আরও আগে। তার নিজের বিয়ের দিনে। বৌভাতের সন্ধ্যায়। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়, ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসেছিলেন, সঙ্গে দেহরক্ষী। মজা করে কথাটা বলেছিল এক খুড়তুতো ভাই— আরে আমাদের পিসেমশাই তো এমন রানিং ঢপ-টপ দিয়েই থাকেন, ওই দ্যাখ অমুক আই জি, ওই যে অমুক কোম্পানির চেয়ারম্যান— তাই ভদ্রলোককে দেখলেও তেমন মন দিয়ে দেখিনি! এ হে, উনি যে এতজনকে টপকে এভাবে ডিজি হয়ে যাবেন, আগে জানলে ভালো করে দেখতাম...

বরং রূপমের শ্যালক বলেছিল ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্বের আসল কথাটি। যখন যে-পদেই থাকুন, উনি সবসময়েই সামাজিক-পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলোকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দ্যাখেন, অ্যাটেন্ড করেন। এটা তো ঠিক, বাইরে থেকে দেখলে পুলিশের কাজ অন্ধকার জগৎ নিয়ে। নানারকম অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যেতে হয়, ট্যাকল করতে হয়। তাই আলোর পিপাসা খুব স্বাভাবিক...তাছাড়া, পুলিশ তো সমাজের বাইরের কিছু না, যতই বলা হোক রাষ্ট্রের সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী... যেমন দেশ, তেমনই তার পুলিশ!

মনে পড়ে যাচ্ছিল তারও মাত্র কয়েকবছর আগেকার কথা। উঁচু উঁচু চাকরির পরীক্ষায় দল বেঁধে অনেকেই বসে, লিখিত পরীক্ষায় খুব ভালো করলেও আটকে যায় অন্যখানে। হাইটে ঠেকে যাওয়া বন্ধুবান্ধব কেউ একজন বেশ মজা করে বলেছিল, সুখে পড়ে থাকি নীচুতেই, থাকি নীচুতেই! আমার পক্ষে অ্যালায়েড সার্ভিসই সুটেবল, যা সব রিগারাস র‍্যাগিঙের মধ্যে দিয়ে আই পি এস অফিসারদের যেতে হয় বলে শুনি...

কল্পনার অন্ধকার ডানায় উড়ে, শোনা কথা গুরুত্ব পায় অনেক বেশিই। আই আই টি বা অমন নানান ইন্সটিটিউটের র‍্যাগিং নিয়ে গল্প ছড়ায় যেমন। বাস্তবে কিছু কিছু তো অবশ্যই ঘটে! কিন্তু ওসব শুনে টুনে নয়, বড় পুলিশ অফিসারদের মোটা মোটা বই সামনে নিয়ে পরীক্ষা দিতে দেখে রূপম ঘাবড়ে গিয়েছিল। পি এস সি-র পরীক্ষার হলে। বাব্বারে, ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করা থেকে রহস্য তদন্ত, তার পরে আবার পরীক্ষা থেকেও রেহাই নেই? অভিজ্ঞ কেউ একজন বুঝিয়েছিল, আরে পরীক্ষার বেড়া টপকে টপকে এগনো দারুণ একরকম নেশা, বুঝলে? অমন পরীক্ষা কিন্তু কিছু কিছু তোমাকেও দিতে হবে... যদিও তোমাদের আনসিভিল সার্ভিস, কিন্তু জীবনে উন্নতি তো করতে হবেই, না কি? অত মোটা মোটা বই দেখে ভয় পাবার কী হলো, আইনের বই অমনই হয়। দেখে দেখে লেখার নিয়ম। কোন ধারার সঙ্গে কোন উপধারা...ওসব বাইরে থেকে দেখলে খটোমটো লাগে বটে...

কিন্তু সংসারের র‍্যাগিংগুলো যে অতি সরলভাবে সত্যি। তার ভেতর দিয়ে নানাভাবে যেতে হয় বিবাহিত পুরুষদের। হ্যাঁ, পুরুষদেরই, যতই দুর্বল বলে মেয়েদের পক্ষে আইনের সুরক্ষা-টুরক্ষা থাকুক— কে না জানে, সংসারে মেয়েরাই সম্রাজ্ঞী? তাছাড়া, নারী ও পুরুষে তো ভেদ বা দ্বন্দ্ব নেই কোনও, ভেদাভেদের লড়াই শুধু ক্ষমতার ভাগাভাগিতে। ধনী ও গরিবে। মিত্রশক্তি-অক্ষশক্তিতে কে কোন পক্ষে ছিল, আজকের ছেলেপুলেরা কজন তা ঠিকঠাক বলতে পারে? রাজনীতিতেও কি চিরন্তন শত্রু বা মিত্র কেউ হয়? স্ট্রেঞ্জ বেডফেলোজ ...হ্যাঁ, জীবনের বিছানায় গোলাপের পাপড়ি বা কাঁটা যাই বিছানো থাকুক, শুয়ে শুয়ে কে র‍্যাগিং চালিয়ে গেলে, জীবনের সুন্দর সকালগুলোতেও কি দুঃস্বপ্ন তাড়া করে না?

হিজিবিজবিজ শুনে শ্রোতার চোখ

গোল গোল হয়ে যাচ্ছিল বলে, শোয়াশুয়ির র‍্যাগিং নিয়ে রূপম কিছু বলতে সাহস করে না। কোনওদিনই করেনি। র‍্যাগিং-এর ধরন-ধারণ যে অনাদিকালের স্রোত বেয়ে মোটামুটি একই ধারায় বয়। সেটা বন্ধুবান্ধবদের আড্ডা থেকে বুঝে নিতে পারলে বরং অনেক স্বস্তি। আদিরসের আবহ বেশ কলুষ-তামস-নাশক। কিন্তু, তেমন কিছু না ঘটলেও যদি বউ বলে, এবার পুলিশ দিয়ে মার খাওয়াবো?

বন্ধুদেরও বলতে সাহস হয় না এসব। বরং, সে-ও কতকাল আগের কথা, বউয়ের দাদারাও হো হো করে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, এই যাঃ এটা নতুন ধরনের শুনছি! তোমার বউকে অত পাত্তা কে দেয়, অ্যাঁ?

তাই তো। বেডফেলোরা কতভাবে স্ট্রেঞ্জ, স্ট্রেঞ্জার, স্ট্রেঞ্জেস্ট; সে খবর ছেলেছোকরারা কতটুকুই বা রাখে? শুকতারা-আনন্দমেলার বাইরে খবরের কাগজের পাতায় শুধু মেয়েদের ওপর নানারকম অত্যাচারের বিবরণ পড়তে পড়তেই ছেলেপুলেরা বড় হয় আজকাল। কেরিয়ার গড়ার দৌড়োদৌড়িতে দুখ-জাগানিয়া ঘুম-ভাঙানিয়া শিল্পসাহিত্যের কাছে পৌঁছনোর সময় কই? জীবন যে শুধুই হুল্লালায় ভরা!

রূপম তাই সত্যিকারের বড়বেলায়, জীবনের না পড়া বইগুলোর দিকে মুখ ফেরাল ধীরে ধীরে। বউ মুখ ঘোরালো কি ঘোরালো না, কিছুই আর আসে যায় না তাতে এমন একটা আবেশে, দৈনন্দিন সমস্ত কাজেরই বাইরে চলে যাচ্ছিল সে, নেহাৎ অনসিভিল সার্ভিস বলেই চাকরিটা যায় না। চুরিচামারি করার দুঃসাহসও যে তার নেই!

ক্রমে ক্রমে রূপ টের পায়, সঙ্গীর সঙ্গে স্ট্রেট লাইনে কথা বলতে বলতে, হালকা চালে নানারকম বিয়েবাড়ির গল্পেই সে ভেসে চলেছে। দুর্নীতি করতে করতে কত কত আনসিভিল দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা শেষমেষ থপথপে হয়ে যেতে যেতে, জবুথবু হয়ে যান। দোষ পড়ে শুধু পুলিশের ওপর। ওই যে বলে না, সকল পক্ষী মৎস্যভক্ষী, মাছরাঙাটি কলঙ্কিনী? যেমন দেশ, যেমন সমাজ...

রূপমের শ্যালক বোধহয় নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে র‍্যাগিং-এর রূপরেখা কার ক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করে, খানিক বুঝেছিল। সমাজ ও পুলিশের আলো-অন্ধকারের কথা ছেড়ে, সেই অনেকদিন আগেই রূপসাকে সে বলেছে, ন্যায়-অন্যায় কি দুর্নীতির কথায় যাচ্ছি না। কিন্তু অনেককে সুপারসিড করে ওই সর্বোচ্চ চেয়ারে, জ্যোতি বসুর আমলে তাঁর অভিষেক, বিস্ময়কর। কেননা, চিরকালই উনি খুব অ্যান্টি- কমিউনিস্ট মাইন্ডেড পার্সন বলে পরিচিত...

—ছাড়ো, আমি বরং ভাবছি, sede দিয়ে শেষ হচ্ছে এই একটাই শুধু ইংরিজি শব্দ...

সুপারসিড শব্দটার অন্তর্নিহিত অপমান অন্যভাবে রূপমকেও যে ধাক্কা দিয়েছে! অন্তত কয়েকমাস কি বছর খানেকের জন্য হলেও, ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় পাশ করে প্রোমোশান নিয়ে উঁচুতে উঠে যাচ্ছে তারই ব্যাচের লোকজন, মনে হলে, মুখটা একটু কালো হয়ই। না হয় বউ তার পদগৌরব নিয়ে প্রতিবেশীর কাছে ফাঁট দেখাচ্ছে না, না হয় যা বেতন মেলে, কম-কম হলেও তা দিয়ে দিন দিব্যি চলে যাচ্ছে...

তবু, রূপকথার গল্পে ডুবে খাবারই অভ্যেসে, দিনের পর দিন কেটে যাবার নিয়মে, বয়োবৃদ্ধির স্বাভাবিক ধর্মে, রূপমও পরীক্ষার গাঁট পার হয়ে যায় একদিন। সেই বন্ধুটিকে মনে পড়ে, যে বলত, কাম-কাজের চেয়েও বড় পরীক্ষার নেশা। মনে হয়, উঁচু চাকরি পেয়েও আরও উঁচু, সুদূর কিছুর ইশারায় অন্যদিকে চলে যাওয়া মানুষদের। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ঋষি অরবিন্দ থেকে এখনকার অন্নদাশংকর রায় অবধি কাজ যাদের ছড়ানো নানান দিকে—

জবুথবু বিপরীতে একটু ধাক্কা দিতেই বুঝি সঙ্গীকে রূপম বোঝায় আরে তাই তো সেই সোনার ঘণ্টার কথা তুললাম—ফ্রান্সিস নামটা শুনে তোমার মনে তো কিছুই বেজে উঠল না! উঁচুমহলে, উঁচু পর্যায়ে সব প্রোমোশন পোস্টিংই পলিটিকাল, ওসব নিয়ে ভাবতে নেই। ভাবছি রামায়ণ মহাভারতের কথা! রাজ্য জয় করেও যারা সিংহাসনে বসল না...যুদ্ধে জেতার পরেও...

—ফ্র্যান্সিস বলতে কিন্তু মনে আসে স্যার ফ্র্যান্সিস ফিলিপকে। বেরসিক ব্যাঘাতে সঙ্গী বলে ওঠে, মানে ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে শত্রুতার কারণে যিনি বিখ্যাত—

—আজকাল তো কেউ ডুয়েল-টুয়েল লড়ে না, ধরনটাই গেছে পাল্টে! লড়াই ক্রমে কাগজে-কলমে। উঁহু, নাম করব না, এই ভদ্রলোক যখন সর্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত, তখনই, তৎক্ষণাৎ একজন পদত্যাগ করেছিলেন। কী আশ্চর্য, সত্যি...কী অদ্ভুত দ্যাখো তো, কাগজে পড়া নামটুকু ছাড়া কিছু জানি না, কাজের ক্ষেত্র চিনি না—তিনি অমন চিরনবীন কিশোর হয়ে আমার স্বপ্নে কীভাবে যে এলেন! সিম্পল সাইমন মেট আ পাই-ম্যান—উঁহু, ছোটবেলার ছড়াতেও যে তোমার মনে কিছুই টুংটাং করে উঠবে না...

আমি কিন্তু সেই চিরনবীনের হাত ধরে দিগন্ত থেকে দিগন্তে উড়ে যাচ্ছিলাম। কেল্লা থেকে টপকে যাচ্ছিলাম অন্য কেল্লায়। কখনও ঘোড়ার পিঠে, কখনও পাখির ডানায়, কত ঘন অরণ্য, মাঠ, সবুজ ধানক্ষেত...কিছু কিছু জনপদ, পাহাড়-পর্বত-নদী পেরিয়ে যেতে যেতে আবারও একটা গেরুয়া আলোর পথ...পেছনে খুব উৎসাহ দিচ্ছিল আমাদের কলেজের ছেলেমেয়েরা। সহচর কিশোরটির মুখ দেখছি না, কিন্তু হিজিবিজবিজের রহস্য-গল্পের মতন কোনও ঝাপসা ধোঁয়াশা কিন্তু নেই!

জানি, সে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে সীমানাহীন এমন এক দেশে, যেখানে চোর-ডাকাত-পুলিশ-ফুলিশ কিছু নেই। সিংহাসনও নেই কোনও। আছে শুধু মানুষ, মানুষ, আর মানুষ... ▮

দৃষ্টিহীনদের লেখাপড়া

একটা সময় ছিল যখন দৃষ্টিহীন শিশুদের কাছে লেখাপড়া করাটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। সেকালে মোটা কাগজের ওপর ঠেলে তোলা অক্ষরের সাহায্যে তাদের পড়াশুনা করানো হতো। দৃষ্টিহীনদের কাছে তা অত্যন্ত

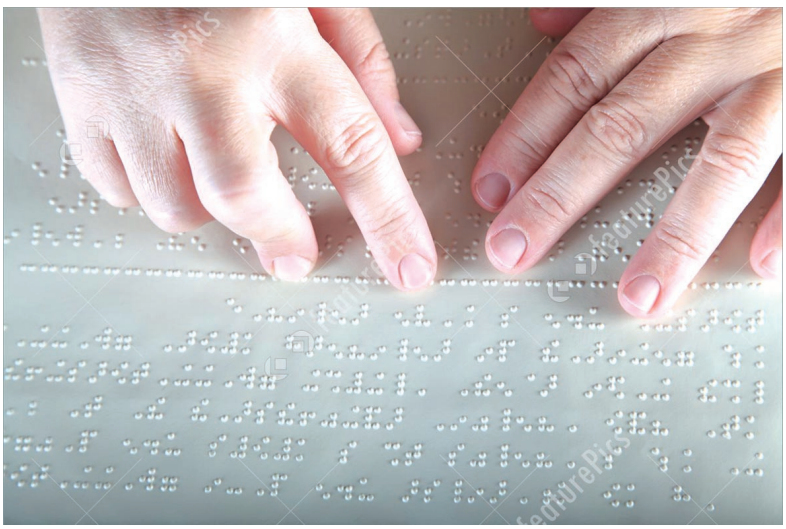

জটিল ও কষ্টকর ছিল। ব্রেইল লিপি আবিষ্কার হওয়াতে এই জটিলতা ও কষ্টের অবসান ঘটে।

ব্রেইল লিপির আবিষ্কারক ছিলেন মঁসিয়ে লুই ব্রেইল। তিনি ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ৪ জানুয়ারি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের কাছে কুপত্রে নামে একটি ছোটো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা খুবই গরিব ছিলেন। লুইয়ের বয়স যখন তিন বছর তখন এক দুর্ঘটনায় তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। পড়াশুনার প্রতি তীব্র আগ্রহ তাঁকে ব্রেইল পদ্ধতি আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত করে।

যুদ্ধের সময় গোপন খবর আদান প্রদানের জন্য ক্যাপ্টেন চালর্স বারবিয়ার নামে একজন ফরাসি সৈনিক ১২ টি বিন্দু দিয়ে কিছু সাংকেতিক চিহ্নের উদ্ভাবন করেন। রাতের অন্ধকারে এগুলি স্পর্শ করে বোঝা যেত। ক্যাপ্টেন বারবিয়রের সঙ্গে লুই দেখা করেন এবং এই সাংকেতিক পদ্ধতিকে দৃষ্টিহীনদের লেখাপড়ার উপযুক্ত করে তুলতে অনুমতি চাইলেন। চালর্স আনন্দের সঙ্গে লুইয়ের আবেদনে সাড়া দেন।

চালর্সের অনুমতি পেয়ে লুই এই পদ্ধতিটি নিয়ে নানান চিন্তা ও গবেষণা শুরু করে দেন। এই সময় লুই ১২টি বিন্দুর সঙ্গে আরও ৬ টি বিন্দু বিভিন্নভাবে বসিয়ে ৬৩টি চিহ্ন তৈরি করেন। এভাবে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লুইয়ের দ্বারা ব্রেইল লিপির আবিষ্কার হয়। ব্রেইল লিপি রূপে যে ৬৩টি চিহ্ন দৃষ্টিহীন ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনার জন্য ব্যবহার করে তা দিয়ে পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায় সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে ব্রেইল পুস্তক ছাপানো হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, ব্রেইল লিপি দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এক আলোর দরজা খুলে জিয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি দৃষ্টিহীনদের লেখাপড়ায় যতই সহায়ক হোক না কেন ব্রেইল লিপির বিকল্প আজও আবিষ্কার হয়নি।

প্রণব সিংহ

ভারতের পথে পথে

গোলকুণ্ডা দুর্গ

হায়দরাবাদ শহর থেকে এগারো কিলোমিটার পশ্চিমে গোলকুণ্ডা দুর্গ। কথিত যাদব দেবতা গোল্লাস থেকে গোলকুণ্ডা, অন্য মতে তেলুগু শব্দ গোল্লা অর্থ মেষপালক আর কোণ্ডা অর্থ পাহাড় থেকেই নামকরণ হয়েছে। মোচারূপী গ্রানাইট পাথরের পাহাড় চূড়ায় মাটির তৈরি ইতিহাসখ্যাত গোলকুণ্ডা দুর্গ। দ্বাদশ শতাব্দীতে ওয়ারাঙ্গলের কাকতীয় রাজা গণপতি ওটি নির্মাণ করান। পরে গুলবর্গার বাহমণি সুলতানদের দখলে যায় দুর্গ। এই সময় মাটি থেকে পাথরে রূপান্তর ঘটে দুর্গের। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজবংশের হাতে যায় এই দুর্গ। সংস্কারও হয়েছে বার বার এই দুর্গের। অভিনবত্ব রয়েছে দুর্গের নির্মাণ শৈলীতে। দুর্গের পরিধি ১১ কিলোমিটার। ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ, ১৫ থেকে ১৮ মিটার উঁচু দেওয়ালে বেষ্টিত। অলংকৃত গ্রানাইট পাথরের ৮টি প্রবেশদ্বার, হাতির আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গজাল বসানো দরজা ও ৮৭ টি বুরুজ।

জানো কি?

- ভারতে প্রথম তৈরি রঙিন চলচ্চিত্রের নাম সৈরিন্ধ্রী (ইংরেজি)।
- দাদাসাহেব ফালকে ৯৭টি ছবি পরিচালনা করেন।
- ভারতে তৈরি প্রথম ইংরেজি ছবির নাম নুরজাহান।
- ভারতের প্রথম মহিলা সংগীত পরিচালক জাদ্দেনবাঈ।
- প্রথম ভারতীয় ৭০মিমি ছবিটির নাম অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড।
- ইন্দ্রপ্রভা ছবিতে ৭১টি গান ব্যবহার করা হয়েছে।

ভালো কথা

আমার অসম ভ্রমণ

লিচু পাকার সময় আমাদের এলাকায় বহু পাখি মারা পড়ে। লিচু যাতে পাখিতে না খেতে পারে তার জন্য বাগানের গাছগুলো জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হতো। পাখিরা জাল দেখতে পায় না। ফলের লোভে গাছে উড়ে এসে বসলেই জালে জড়িয়ে পড়ে। যতই ঝটপট করে ততই বেশি জড়িয়ে যায়। শেষে মারা যায়। এবারে আগে থেকেই অরুণ জেঠু সবাইকে বলে রেখেছিল গাছে জাল লাগানো যাবে না। তার বদলে গাছের ডালে বড় ঘণ্টা বা টিন বেঁধে দড়িটা বাড়ি অবধি বা জোগানদারদের মাচায় বাঁধা থাকবে আর মাঝে মাঝে দড়ি ধরে টানলে শব্দ হবে। ফলে পাখি ভয়ে পালিয়ে যাবে। এরকম করার ফলে এবার পাখি মারা যায়নি। তবে দু'একজন হিংসুটে লোক গাছে জাল লাগিয়েছিল।

মৈনাক দাস, জালুয়াবাধাল, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) তি ন ন্তা ন্ত স	(১) ন ল তা তা বি
(২) বী জী র্ষ ত ব	(২) রী হ সু র ন্দ

১৬ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) ধারকবাহক (২) ধানাইপানাই

১৬ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) পবনমুক্তাসন(২) পশ্চিমোত্তাসন

উত্তরদাতার নাম

(১) সুতনু দাস, বসিরহাট। (২) দেবাশিস পাল, মেমারী, বর্ধমান। (৩) সোমা মুন্সী, চন্দননগর। (৪) অপূর্ব কুমার রায়, জগাছা, হাওড়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

শরিয়তি আদালতের দাবি মৌলানাদের স্বার্থে

দেবযানী ভট্টাচার্য

অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড (এ আই এম পি এল বি) যে প্রতি জেলায় শরিয়তি আদালত দাবি করল, তার প্রকৃত সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে। কেবলমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের মেরুকরণ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য, এমনটা বোধ হয় নয়। কারণ কংগ্রেস বা অন্যান্য সেকুলার দলগুলি তাঁদের মেরুকরণের উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে দিলে এ আই এম পি এল বি-র যত না লাভ হবে, সেই দলগুলির লাভ হবে তার চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষত এ আই এম পি এল বি-র দাবি কিংবা মতামত যে ভারত সরকারকে মানতেই হবে, এরকম কোনও সুনিশ্চিত সাংবিধানিক নির্দেশিকা যেখানে নেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে সন্দেহ হয় যে ওঁদের এমন দাবির পিছনে নিশ্চিতভাবেই কোনো গভীরতর উদ্দেশ্য আছে এবং সে উদ্দেশ্য যত না মুসলমান জনসাধারণের মঙ্গলার্থে, তার চেয়ে এ আই এম পি এল বি, উলেমা, মৌলানা ইত্যাদিদের মঙ্গলার্থে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

মুসলমান সমাজে মৌলানাদের গুরুত্ব অত্যধিক। তাঁদের বিধান অনুসারে ওঠাবসা করতে তারা বাধ্য হয়। একত্রিত মুসলমানভোট কার ঝুলিতে যাবে তা স্থির করার পরিবর্তে ক্ষীরটিও ওঁরাই লেহন করেন। সাধারণ দরিদ্র মুসলমান তার কোনও ভাগ পায় না। তাই প্রশ্ন হলো, জেলাপ্রতি শরিয়তি আদালত স্থাপন করতে পারলে এই ধর্মগুরুদের কী এমন অতিরিক্ত সুবিধা হবে যা তাঁদের এখন হচ্ছে না?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা প্রয়োজন। প্রায় সকলেই হয়তো অবগত যে তিন তালাক বিরোধী বিলটি সংসদের রাজ্যসভায় এখনও পাশ হয়নি। উক্ত বিলটিতে তিন তালাককে cognizable, non-bailable offence বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তিন তালাকপ্রাপ্ত মুসলমান নারী নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে তিন তালাক দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে পুলিশের সাহায্যপ্রার্থী হওয়া মাত্র পুলিশ তাঁর অভিযোগ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ বিলটি অনুসারে পুলিশের পক্ষে অভিযোগের cognizance না নিয়ে বা অভিযোগ গ্রহণ না করে স্বামীটির সুবিধা করে দেওয়ার কোনো উপায় নেই। পুলিশকে অভিযোগ গ্রহণ করতে হবে ও প্রয়োজনে স্বামীকে গ্রেপ্তার করতেও হবে। আর একবার গ্রেপ্তার করলে আদালতে না নিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তে পুলিশের পক্ষে তাকে জামিন দিয়ে বা না দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার উপায় থাকবে না। বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে কোর্ট অবধি গড়াবে এবং আদালত চাইলে সেই স্বামীকে জামিন দিতে পারবেন।

ইসলামে একজন পুরুষ চারটি বৈধ বিবাহ করতে পারে। কিন্তু ইসলামের নির্দেশ হলো একাধিক বিবাহ একজন পুরুষ তখনই করতে পারে যদি সে তার প্রতি স্ত্রীকে সম্পূর্ণ সমদৃষ্টিতে দেখতে পারে এবং তাদের সম্পূর্ণ সমান স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করতে পারে। তা যদি সে না পারে, তাহলে একাধিক বিবাহ ইসলামসম্মত নয়। তবে, এক বা একাধিক (৪ এর কম) স্ত্রী বর্তমান থাকাকালীন বিবাহোচ্ছুক কোনো বিশেষ মুসলমান পুরুষ তার নতুন স্ত্রীকে পুরাতন স্ত্রীদের সঙ্গে সমদৃষ্টিতে দেখতে সক্ষম কিনা, সেকথা স্থির করার অধিকার সম্ভবত কেবলমাত্র তার বর্তমান স্ত্রীদেরই আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো মুসলমান পুরুষ তার স্ত্রী বর্তমান থাকতেও পুনর্বিবাহ করতে গেলে বর্তমান স্ত্রীদের তা নিয়ে আপত্তি জানানোর বাস্তবে কোনো উপায়ই নেই কারণ আপত্তি জানাতে গেলে তাদের তিন তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার ভয় থাকে। কিন্তু তিন তালাকের ভয় না থাকলে স্বাভিমানী নারী অনায়াসে তার স্বামীর পুনর্বিবাহে এই বলে আপত্তি জানাতেই পারে যে, তার স্বামীর পক্ষে একাধিক স্ত্রীকে সমান সমাদর করা সম্ভব নয়। এবং এমতাবস্থায় পুরুষের একাধিক বিবাহ ইসলামের নিয়ম অনুসারে অনুমোদনযোগ্য নয়। অর্থাৎ তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথার বিলুপ্তির প্রায় অবশ্যম্ভাবী after effect হলো বহুবিবাহ প্রথায় বাধা।

ওদের এই সমস্ত সামাজিক প্রথা/কুপ্রথার নিয়ামক রূপে বিরাজ করেন এই কাজী, মৌলানাদি ব্যক্তিবর্গ। এতে করে ওঁদের প্রভূত অর্থযোগও থাকে। পুরুষ চাইলেই তালাক দেবে, আবার বিবাহ করবে। তালাকপ্রাপ্তা মহিলা উলেমাদের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়বে, তারপর তাকে উদ্ধার করতে হলেও করবেন মৌলানারাই। এই প্রতিটি ধাপেই মৌলানাদের উপার্জন বহুলাংশে কমবে। উপরন্তু নিকাহ্ হালালাও যদি ভারতীয় আদালতের নির্দেশে কালক্রমে রদ হয়ে যায়, তা হলেও ওঁদের মুদ্রপ্রাপ্তি অন্যতর ইহলৌকিক প্রাপ্তি আরও হ্রাস পাবে। এই সমস্ত আসন্ন ক্ষতির উপক্রম আঁচ করতে পেরেই বোধ করি এ আই এম পি এল বি জেলাপ্রতি শরিয়তি আদালত চেয়ে বসেছে, যদিও সে চাহিদা পূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেই ঘোষণা করেছে ভারত সরকার।

মুসলমান নারী তিনি তালাকের অভিযোগ নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হলে পুলিশ যখন স্বামীকে তলব করবে, তখন স্বামী যদি দেখিয়ে দিতে পারে যে সে তার স্ত্রীকে তাৎক্ষণিক তিন তালাক দেয়নি, বরং প্রথা মেনে শরিয়তি আদালতকে সাক্ষী রেখে ইসলাম নির্দিষ্ট পথে বৈধ তালাকই দিয়েছে, তা হলে সেই তালাককে বৈধ ও ইসলামসম্মত বলে গ্রহণ করবার নৈতিক দায় পুলিশ ও আদালত উভয়েরই থাকবে। এবং প্রতি অবৈধ তাৎক্ষণিক তিন তালাকের বৈধকরণ উপলক্ষ্যে মৌলানাদের মুদ্রাপ্রাপ্তি ঘটতেই থাকবে। আর শরিয়তি আদালত যদি নিকটবর্তী অঞ্চলে না থাকে, তবে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী যদি পুলিশে অভিযোগ করে, তবে স্বামীর পক্ষে খুব শীঘ্র তার বৈধকরণ করে তার মিথ্যা প্রমাণ পেশ করতে অসুবিধা হবে। তাই শরিয়তী কোর্ট যদি প্রতি জেলায় থাকে, তবে ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে প্রায় সমস্ত মুসলমানেরই অবৈধ তালাকের বৈধরূপে সুবিধা হবে। ■

চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স সেরা দল বেলজিয়াম

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ বছরের ফিফা বিশ্বকাপ এক অমোঘ শিক্ষা দিয়ে গেল বিশ্ববাসীকে। সবসময় সেরা দলই যে চ্যাম্পিয়ন হবে তার কোনো বিধিসম্মত নিয়ম নেই। তাই বোধহয় বিশ্বকে আবেগমথিত করেও বেলজিয়ামকে থেমে যেতে হয় সেমিফাইনালে। তবে ফ্রান্স শিল্পের দেশ, সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, তাই 'লে ব্লুজরা' কাপ জিতে নেওয়ায় সনাতন পন্থী সমর্থকেরা যথেষ্ট খুশি হয়েছে। ১৯৯৮-এ যে দল নিয়ে ফ্রান্স প্রথমবার বিশ্বজয় করেছিল, সেই দল ধারে-ভারে অনেক এগিয়ে থাকবে এই দলের চেয়ে। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয়, সেই দলে আফ্রিকান অভিবাসী বড় একটা ছিল না। থিওরি অরি আর মার্সেল দেসাই ছাড়া। এই দলে অধিকাংশই অভিবাসী, আর তারাই বিশ্বকাপে টেনে নিয়ে গেছে ফ্রান্সকে। তাই একথা বলার সময় এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন যতই অভিবাসন নীতি পরিবর্তন করার জন্য সচেষ্ট হোক না কেন, তাদের দেশ-সহ ইউরোপের বহু দেশ আজ বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন খেলায় যে দাপট দেখাচ্ছে তার পিছনে চালিকাশক্তি ওই আফ্রিকান 'ব্ল্যাক পাওয়ার'।

কাইলান এমবাপে শ্রেষ্ঠ উদীয়মান খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন। অসাধারণ এক প্রতিভা এই এমবাপে। এই ফরাসি অভিবাসী খেলোয়াড়টির খেলায় যেন সেই স্বর্ণযুগের ব্রাজিলিয়ান শিল্প-সুষমার ঝলক। প্রচণ্ড গতিতে অপারেট করতে পারেন মাঝখান এবং উইং ধরে। দু'পায়ে গোলার মতো শট রয়েছে। এমবাপের সঙ্গে গল পোগবা, কন্তে মিলে যে ত্রিভুজ আক্রমণ তৈরি করেছে প্রতিটি ম্যাচে, তার থেকে অধিকাংশ গোল উঠে এসেছে। এই তিনজন ছাড়া আর এক কৃষ্ণাঙ্গ অভিবাসী উমেতিতি গোটা টুর্নামেন্টে রক্ষণভাগকে পরম নির্ভরতা দিয়েছে। তবে গ্রিজম্যান, জিহুর, রাফায়েল ভাবান, গোলকিপার অধিনায়ক হুগোলারিয়িং এই চার শ্বেতাঙ্গ ফুটবলারও চমৎকার সঙ্গ করে গেছেন তাদের সঙ্গে। বিশেষ করে নকআউটে প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনা এবং ফাইনালে ক্রোয়েশিয়া ফ্রান্সের এই আট তারকার দাপটে একপ্রকার হাল ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। ফাইনালে ক্রোয়েশিয়া যথেষ্ট লড়াই করেও হালে পানি পায়নি।

এই বিশ্বকাপে বেলজিয়াম এবং ক্রোয়েশিয়াই গোটা মাঠটিকে বড় করে খেলতে পেরেছে। গতি, শক্তির সঙ্গে স্কিল এবং সর্বোচ্চমানের টেকনিককে মিশিয়ে যে খেলাটা খেলেছে এই দুই দেশ, তা আগামী চার বছর ধরে গবেষণার খোরাক জোগাবে ফুটবল তাত্ত্বিকদের। ক্রোয়েশিয়ার সুপারস্টার অধিনায়ক লুকা মদ্রিচ আসরের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়ে সোনার বল পেয়েছেন। আর ব্রিটিশ অধিনায়ক হ্যারি কেন সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে সোনার বুট জিতে নিয়েছেন। ক্রোয়েশিয়ার তিন তারকা মদ্রিচ, র‍্যাকিটিচ, পেরিসিচের ত্রিফলা আক্রমণ এবং গোটা মাঠ জুড়ে প্যাটার্ন উইভিং প্রেসিং ফুটবল দেখে বিশেষজ্ঞরা সেই ৭০/৮০ দশকের নেদারল্যান্ডের টোটাল বা ডায়মণ্ড সিস্টেমকে স্মরণ করেছেন মাঝেমধ্যেই তবে ফ্রান্সকে নকআউট স্টেজ থেকে একের পর এক কঠিন প্রতিপক্ষকে অতিক্রম করে ফাইনালে পৌঁছতে হয়েছে। আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, বেলজিয়ামের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে ফাইনালেও যে একই উদ্দীপনা ও দক্ষতার সম্মিলনে উচ্চকোটির ফুটবল খেলেছে ফ্রান্স তার জন্য কোনো প্রসংশাই যথেষ্ট নয়।

সবশেষে বলতে হয় আয়োজক দেশ রাশিয়ার কথা। এযাবৎকালের মধ্যে সবসেরা আয়োজক দেশ রাশিয়া। প্রতিটি অংশগ্রহণকারী দেশ রাশিয়ার সাংগঠনিক কুশলতা ও অতিথিপরায়ণতায় মুগ্ধ। আর ফিফা ও রুশ সরকারের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় যে বিরাট কর্মযজ্ঞকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত করেছে রাশিয়ার ফুটবল ফেডারেশন তার রেশ থেকে যাবে বহু বছর। প্রতিটি পরিকাঠামো নির্মাণ থেকে বিজ্ঞাপন, এনডোর্সমেন্ট থেকে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা আয় করেছে রাশিয়া তা দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে মজবুত করবে। কয়েক লাখ মানুষের পাকাপাকি কর্মসংস্থান হবে। দেশের কিশোর ও যুব প্রজন্ম আরো বেশি করে ফুটবলে উৎসাহী হবে। অ্যাথলেটিক্স, জিমনাস্টিক্স, ভলিবল, টেনিস, দাবা রাশিয়ার প্রধান ক্রীড়া-সংস্কৃতি। তার সঙ্গে যোগ হতে চলেছে সকার সিনড্রোম ক্রেজ। ■

অন্য রকম

স্বপ্নের পিছু ধাওয়া করে সাফল্যের শীর্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সুরভি গৌতম যখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী তখন তিনি আই এ এস পরীক্ষায় বসার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও আই এ এস পরীক্ষায় বসার জন্য তাকে কী করতে হবে, কতটা পরিশ্রম করতে হবে, সে সম্বন্ধে তিনি তখন কিছুই জানতেন না। শুধু এইটুকু জানতেন তাকে আই এ এস পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। বড়ো অফিসার হতে হবে।

স্বপ্নপূরণের কোনও শর্টকাট হয় না। সুরভি জানতেন। সম্প্রতি এক ইংরেজি সংবাদমাধ্যমের কাছে তিনি শুনিয়েছেন তাঁর কঠিন পথ চলার গল্প। 'আমি জানি আই এ এস অফিসারদের সাধারণ মানুষ খুব সম্মান করেন। আমিও ওই সম্মান পেতে চাই।' কিন্তু শুধু ইচ্ছেশক্তির জোরেই কি কেউ সফল হতে পারে? অবশ্যই না। সুরভি বলেন, 'সফল হতে গেলে কঠোর পরিশ্রম দরকার। যেখানে আমি পৌঁছতে চাই সেই জায়গাটা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকাও জরুরি।'

সুরভির জন্ম মধ্যপ্রদেশের এক অজ পাড়াগাঁয়ে। গোঁড়া রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবার। পরিবারের মোট সদস্যসংখ্যা ৩০ জন। মেয়ে বলে ছোটবেলায় কোনও বিরূপ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি না হলেও, আলাদা করে খাতিরও পাননি। সুরভির জন্মদিন পালিত হতো আর পাঁচটা সাধারণ দিনের মতো। যদিও ২৫ বছর পর ছবিটা বদলে গিয়েছিল। নতুন আই এ এস অফিসারকে ফুলের

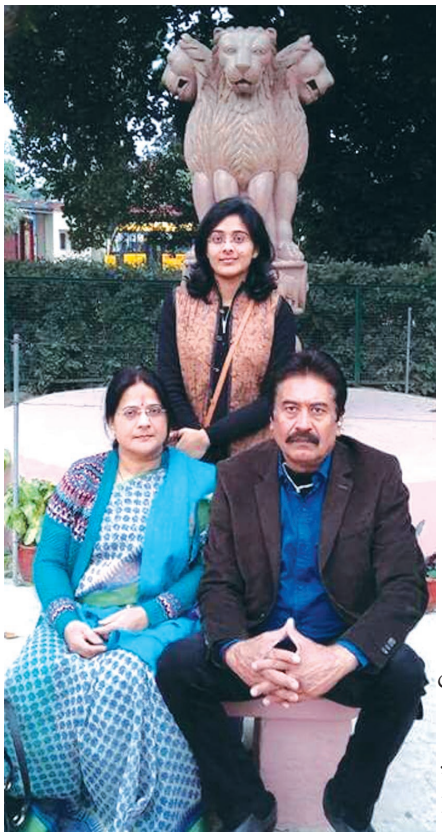

বাবা-মার সঙ্গে সুরভি।

মালা পরিয়ে বরণ করার জন্য ভেঙে পড়েছিল গোটা গ্রাম।

ছাত্র হিসেবে তাকে মেধাবীই বলতে হবে। পঞ্চম শ্রেণীর অঙ্ক পরীক্ষার কথা এখনও তিনি মনে করতে পারেন। 'সেবার অঙ্কে আমি পুরো নম্বর পেয়েছিলাম। তাতে যে প্রশংসা পেয়েছিলাম, আমার আরও ভালো রেজাল্ট করার জেদ বেড়ে যায়।' মাধ্যমিক পরীক্ষায় সুরভি অঙ্কে এবং বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে একশোয় একশো পেয়েছিলেন। ফলে রাজ্যের মেধাতালিকায় তার নাম ওঠে। বলতে গেলে প্রায় রাতারাতি তিনি সেলেব্রিটির তকমা পেয়ে যান।

ওই সময়েই আমার মনে হয়েছিল গ্রামের মানুষের উন্নতি করা প্রয়োজন। বিশেষ করে চিকিৎসা পরিষেবার মান বাড়ানো দরকার। প্রতিটি বাড়িতে যাতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া যায় সে ব্যাপারেও অবিলম্বে কাজ শুরু করতে হবে। আরও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে কাজ করা যায়। এই সব যখন ভাবছি তখন মনে হলো, মানুষের কাজ করতে হলে আমাকে কালেক্টর হতে হবে।'

অনেক আশা নিয়ে আমি ভুপালে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেলাম। জানতাম, আমাকে ভালো করতে হবে। কারণ, আমাদের গ্রামের অনেক মেয়ের জীবন, তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমি কেমন করি, তার ওপর।'

সুরভি তাদের গ্রামের প্রথম কলেজে পড়াশোনা করা মেয়ে। কলেজে গিয়ে সুরভি নতুন এক মুশকিলে পড়লেন। তিনি হিন্দি মাধ্যমের ছাত্রী, কিন্তু কলেজের সহপাঠীরা সকলেই ইংরেজি মাধ্যমের। ইংরেজিতে কথাবার্তায় তুখোড়। প্রথমদিন কলেজে সুরভিকে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে বলা হয়েছিল। তারপর ধেয়ে এসেছিল পদার্থবিদ্যা থেকে দুরূহ প্রশ্ন। উত্তর জানা থাকলেও ইংরেজিতে কথা বলতে না পারার জন্য যেদিন সুরভি কিছুই বলতে পারেননি। তার জন্য তাকে অপমানিতও হতে হয়। 'হস্টেলে ফিরে আমি সারারাত কেঁদেছিলাম। মনে হচ্ছিল গ্রামে ফিরে যাই। বাবা-মাকে ফোন করে সব বললাম। ওরা আমাকে সাহস দিলেন। চ্যালেঞ্জটা নিতে বললেন। এও বললেন, আমি যদি এভাবে ফিরে যাই তাহলে গ্রামের অনেক মেয়ে পথ খুঁজে না পেয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যাবে।'

এরপর সুরভি আর পিছন ফিরে তাকাননি। তিনি শুধু কলেজেই শীর্ষস্থান অধিকার করেননি, উপাচার্যের বৃত্তিও পেয়েছেন। তারপর তাঁর মূল লক্ষ্য। আই এ এস। হ্যাঁ, সেখানেও তিনি সফল। 'আমি গুজরাট ক্যাডারে সুযোগ পেয়েছিলাম। গুজরাটের মানুষ আই এ এস অফিসারদের প্রকৃত অফিসার হিসেবে দেখেন। তাদের কাছ থেকে পারফরম্যান্স আশা করেন।' তিনি বলে চলেন, 'পারফরম্যান্স না করলে এখানে টিকে থাকা যাবে না।'

সুরভি এখন বদোদরার অ্যাসিসট্যান্ট কালেক্টর। এখনও কিছু না কিছু শেখার চেষ্টা করেন। জীবনে যা কিছু পেয়েছেন সেই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে। এখন তার একটাই ইচ্ছে, সবাই তার মতো স্বপ্ন দেখুক। এগিয়ে থাক। ■

অভিন্ন দেওয়ানি বিধিই লাভ জেহাদের মতো কৌশলগুলিকে রুখতে পারে

মাধবী মুখার্জী

বিগত এক দশকে ইসলাম এবং জেহাদ সম্ভবত পৃথিবীর সর্বাধিক চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে। ইসলামি জেহাদের আধুনিকতম কৌশল হলো লাভ্ জেহাদ, ধর্ম জেহাদ, কর্ম জেহাদ, পরকালের জন্য লোভী জেহাদ, অর্থ ও সম্পত্তির লোভে জেহাদ, ব্যবসা-বাণিজ্যে'র জেহাদ, জমি জেহাদ, রাজনৈতিক জেহাদ, সমাজে বা দেশ-বিদেশে মান-সম্মান বাড়ানোর লোভে, জান্নাতের লোভে জেহাদ।

অন্যান্য জেহাদি কৌশলের চেয়ে বর্তমান সমাজপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি কার্যকর এবং নিরাপদ হলো ''লাভ জেহাদ''। অ-মুসলিমরা লাভ জেহাদের অস্তিত্ব শুধু মেনেই নেয়নি বরং জেহাদের বিরুদ্ধে আরও বেশি সোচ্চার হয়েছে দিনের পর দিন। অপরদিকে মুসলমানরা প্রাণপণে জেহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে যাচ্ছে এখনও। তাদের মতে সবই হিন্দুত্ববাদীদের চক্রান্ত। শুধু হিন্দুত্ববাদীরা নয় বরং অন্যান্য ধর্মের মানুষেরাও যে একই কথা বলছে, সে কথা মুসলমানরা অতিসচেতনতার সঙ্গে এড়িয়ে চলেছে আর দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মতে জেহাদ অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন।

বিস্তারিত আলোচনার শুরুতে বলা প্রয়োজন 'লাভ জেহাদ'— এই অভূতপূর্ব পরিকল্পনাটি পাকিস্তানের মাটিতে 'লস্কর-এ-তৈবা' নামক বিশ্বত্রাস সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের গবেষণা প্রসূত। 'লাভ' এবং জেহাদ শব্দ দুটি পৃথক পৃথক ভাবে সকলে শুনলেও একসঙ্গে জোড়কলম শব্দ হিসেবে অধিকাংশ মানুষই তা শোনেননি। 'লাভ'-এর অর্থ হলো প্রেম বা ভালোবাসা আর জেহাদের অর্থ যুদ্ধ। সুতরাং এই জোড়কলম শব্দের অর্থ দাঁড়ায় প্রেম বা ভালোবাসার জন্য যুদ্ধ। এই স্ববিরোধী শব্দের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করাই হলো লাভ জেহাদ-এর মূল উদ্দেশ্য।

যখন সারা দেশ জুড়ে চলছে লাভ জেহাদের মতো ভয়াবহ ষড়যন্ত্র, ঠিক তখনই হাদিয়া ইস্যুতে মামলাগুলি সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। লাভ জেহাদ সংক্রান্ত একটি মামলার তদন্ত শুরু করে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এন আই এ)। হিন্দু মেয়েকে বলপূর্বক বিবাহের অভিযোগের ভিত্তিতে। মহামান্য আদালত সেই মামলার রায় অনুযায়ী মেয়েটিকে তার পিতার কাছে ফেরত পাঠাতে নির্দেশ দেয় এবং ওই মামলাকে লাভ জেহাদের তকমা দেওয়া হয়। হিন্দু মেয়েদের লাভ জেহাদের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না মহামান্য আদালত সেটিরও তদন্ত করে দেখবার নির্দেশ দেন। মহামান্য আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ওই ধর্মান্তরিত বিবাহ অবৈধ, কারণ, তা করা হয়েছে লাভ জেহাদের মাধ্যমে।

সম্প্রতি পুলিশের একটি বিশেষ শাখার তদন্তে জানা গেছে গত ছ'মাসে সাত হাজারের ওপর হিন্দু, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ মেয়েদের ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে বিবাহের মাধ্যমে। 'লাভ জেহাদ' নামে একটি সংস্থা এই কাজের জন্য মুসলমান সুদর্শন যুবকদের নিয়োগ করে থাকে এবং তাদের ফ্যাশনেবল পোশাক-পরিচ্ছদ, মোটর বাইক, মোবাইল ফোন এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। নিয়োগ কৃতদের নির্দেশ দেওয়া হয় অন্য ধর্মের কোনও মেয়েকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করতে এবং বিশেষ নির্দেশও জারি করা হয় তাদের গর্ভে তারা যেন অন্তত চারটি সন্তানের জন্ম দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জেহাদিদের লক্ষ্যবস্তু হলো স্কুল ও কলেজের হিন্দু, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ ইত্যাদি অ-মুসলমান মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা।

'লাভ জেহাদ'-এর পরিকল্পনাটা সফল করা হয় ভালোবাসা বা প্রেমের অভিনয়ের ছদ্মবেশে, অর্থাৎ প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে ছলে-বলে-কৌশলে, মিথ্যা-প্রেমের ফাঁদে ফেলে হিন্দু অথবা অমুসলিম মেয়েদের ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করা এবং তাদের ঔরসজাত মুসলমান সন্তান দ্বারা মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং হিন্দুধর্মকে তুচ্ছ, মিথ্যা এবং কাফেরের ধর্ম প্রমাণ করে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা। লাভ জেহাদের মূল লক্ষ্য হলো কোনো অ-মুসলমান দেশে ধর্মীয় জনবিন্যাসে দ্রুত পরিবর্তন আনা আর একাধিপত্য স্থাপন করা।

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে বন্ধুত্বের ফাঁদ পেতে রেখেছে জেহাদিরা। তাদের নিশানায় রয়েছে সতেরো থেকে সাতাশ বছরের যুবতীরা। এর নেপথ্যে লুকিয়ে আছে লাভ জেহাদের মতো সুগভীর-কৌশলী ষড়যন্ত্র যা জানলে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। ফেসবুকে একটা 'হাই' বা হোয়াটস্অ্যাপে 'হ্যালো'

সাধারণ দৃষ্টিতে খুবই তুচ্ছ, সাধারণ বিষয়, সুতরাং মেয়েরা নিজেও বুঝতে পারে না যে সে 'শিকার' হতে যাচ্ছে। সেই ছদ্মবেশী জেহাদি শিকারি প্রেমিক ছলে বলে কৌশলে সাইকোলজিক্যাল ট্র্যাপিং-এর মাধ্যমে প্রেম এবং যৌনতার মিশ্রণ ঘটিয়ে এতোটাই দায়িত্বশীল যত্নশীলতার পরিচয় দেয় যে মেয়েরা চুম্বকের মতো আকর্ষিত হতে বাধ্য হয়। মেয়েদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলে কিছুদিন দায়িত্বশীল প্রেমিকের অভিনয় করে যায় এবং যৌনতার অনাস্বাদিত স্বাদ দেওয়ার পর মুসলমানধর্মে ধর্মান্তরিত করে ইসলাম মতে বিয়ে করে সন্তান উৎপাদন করে। তারপর আবার একটি মেয়ে, আবার...। এভাবে চলতে থাকে ধারাবাহিক ধর্মান্তরের অনৈতিক কাজ।

মুসলমান ব্যক্তিগত আইন অর্থাৎ শরিয়াতি বিধানের ভিত্তিতে কোরান এবং হাদিশ মতে একসঙ্গে চারটি বিয়ের সম্মতি থাকায় গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার পর অপর শিকারের জন্য ফাঁদ পাতা হয়, কারণ শরিয়াতি বিধানে একসঙ্গে বহু বিবাহ স্বীকৃত সুতরাং কোনও আইনি বাধা নেই।...তাছাড়া তালাক দিতেও কোনও অসুবিধে নেই। প্রতিটি ধর্মান্তরকরণের জন্য দুই থেকে সাত লাখ টাকা পর্যন্ত ইনাম দেওয়া হয় জেহাদিকে। একবার এই ফাঁদে পা দিলে আর রক্ষে নেই। বেরিয়ে আসার সব পথ বন্ধ। শুধু তাই নয়, বিয়ের পর ওই যুবতীদের ইসলামিক দেশে আই এসের যৌনদাসী হিসেবেও পাচার করা হয়।

সম্প্রতি জি নিউজ-সহ কয়েকটা গণমাধ্যমে খবর বের হয়, আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন্ দাউদ ইব্রাহিম ও সমগোত্রীয় মুসলমান ডন্রা লাভ জেহাদে বিনিয়োগ করছেন। এন আই এ এবং দেশের তদন্ত সংস্থার অভিযোগে বলা হয়েছে এই ডন্রা ভারতে বিনোদন জগতে মোটা অঙ্কের পুঁজি বিনিয়োগ করে সিনেমা, টি.ভি. সিরিয়াল, নাটক-এর প্রযোজনা করছেন। এবং সেই সব সিনেমা, নাটক, সিরিয়ালগুলোর গল্পের কেন্দ্রে থাকে অমুসলিম মেয়েদের সঙ্গে মুসলমান ছেলেদের প্রেম, বিবাহ এবং সংসারে উত্তরণ। সে সব গল্পের সারাংশ হলো শিক্ষা ও সভ্যতার অবনতি অপসংস্কৃতির ধারক, যা লাভ জেহাদকে আরো প্রভাবিত এবং প্ররোচিত করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

লাভ জেহাদে আক্রান্ত মেয়েদের পরিণতি সাধারণ আর পাঁচটা মুসলমান মেয়েদের মতো নিরাপত্তাহীন হয়ে পতির ক্রীতদাস হয়ে স্বামীর অন্য স্ত্রীর বা স্ত্রীদের সঙ্গে চুলোচুলি করে এবং অনেক সতীনের মাঝে কষ্ট বুকে চেপে রেখে নারকীয় নির্যাতন সহ্য করে হাসি মুখে জীবন কাটাতে হয়। অথবা তাদের সন্ত্রাসবাদের কাজে লাগানো হয়। আর যদি তালাক প্রাপ্তা হয় তবে পতিগৃহে তার আর স্থান হয় না এবং নিজগৃহে ফিরে আসাও দুস্কর। ফলে, অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে অতি নিম্নবৃত্তির কাজ কিংবা দেহব্যবসার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাসহ শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, সিকিম, গ্যাংটক, দার্জিলিং অঞ্চলে এমন অনেক দেহব্যবসায়ী দেখা যায় যারা লাভ জেহাদে আক্রান্ত, ভুক্তভোগী, অনেকক্ষেত্রে আবার তাদেরকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে দেশ-বিদেশে দেহ ব্যবসার কাজের জন্য পাচার করে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের পাল্লায় পড়ে নিখোঁজ অথবা মৃত্যু বরণ করতে হয়। শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদেই পতি পরিত্যক্তার সংখ্যা দুই লক্ষের উপরে।

তাহলে সমাধান কী? বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মান্তরকরণের কারণে সমাজ ও দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন পর্যন্ত এর ভুক্তভোগী, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ধর্ম-সংস্কৃতির চেতনার অভাবে মেয়েরা লাভ জেহাদের শিকার হচ্ছে। লাভ জেহাদের শিকার হওয়া মেয়েদের বাঁচানো বা উদ্ধার করার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সুতরাং এমন জেহাদি অপরাধগুলোকে অঙ্কুরে বিনাশ করা না গেলে পরবর্তীতে ক্যান্সারের মতো রোগ সারা দেহে ছড়িয়ে পড়বে যার চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব। আমরা জানি এক অপরাধ সমাজে হাজার অপরাধের জন্ম দেয়।

একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এমন সুপরিকল্পিত ভাবে ধর্মান্তর চলতে দেওয়া উচিত নয়। দ্রুত সমাধান করতে হলে একটাই উপায় 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড' চালু করা। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি শুরু হলে সমস্যা এমনিতেই অনেকটা কমে যাবে। মুসলমান মেয়েদের তালাক এবং মিঞার নতুন বিবি ঘরে আনার ভয়-ডর হলে তারা প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাবে। অন্যদিকে আজীবন হাজতবাস যে মৃত্যুর চাইতে অনেক বেশি কষ্টকর সেটা সাধারণ মুসলমানরা খুব ভালো করেই জানে। সুতরাং তারাও একটা বিয়েতে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হবে। ফলে জেহাদি কার্যকলাপকে শেষ করে দিতে সক্ষম হবে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড লাগুর মধ্য দিয়েই তা সম্ভব।

তুরস্ক মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র। ১৯২৬ সালে যে দেশে টারকিস (তুর্কী) সিভিল কোড-এ আনুষ্ঠানিক ভাবে বহুবিবাহকে অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। মরিশাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তিউনিসিয়া এমনকী অন্যতম মুসলিম রাষ্ট্র আরব, সেখানেও ১৯৫৬ সালে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। তাহলে ভারতে মুসলমানদের ক্ষেত্রে বহু বিবাহ বৈধ হবে কেন? একজন অ-মুসলমান মেয়ে মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করলে বা ইসলাম মতে ধর্মান্তরিত হলে তার যে ধরনের সামাজিক এবং আইনগত সমস্যা তৈরি হয় সেই সম্পর্কে সমাজ, রাজ্য, দেশ এত উদাসীনই বা থাকবে কেন? দেশের ধর্মভিত্তিক জনবিন্যাসকে লাভ জেহাদের মাধ্যমে সুপরিকল্পিত ভাবে পালটে ফেলা হচ্ছে যা অদূর ভবিষ্যতে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বিপদের রূপ নিতে পারে। সুতরাং আমাদের মতো প্রতিটি সুস্থ ধর্মনিরপেক্ষ, দেশপ্রেমী ভারতবাসীর এই মুহূর্তের জরুরি কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা অন্যতম কর্তব্য। এই গুরুতর সমস্যার বাস্তব সমাধানের কথা চিন্তা করা এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করার পক্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা। ■

তাপসী পান্নুর মুসলমান প্রীতি

সজনীকান্ত ঘোষ

পিঙ্ক ছবির দৌলতে তাপসী পান্নুর নামটা এখন অনেকেরই শোনা। তার পরবর্তী ছবি 'মুলকে'র মুক্তি আসন্ন। সম্প্রতি ছবির মিউজিক লঞ্চ অনুষ্ঠানে তাপসীর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সারা দেশে শোরগোল পড়ে গেছে। তিনি বলেন, 'ভারতে মুসলমানদের যেভাবে টার্গেট করা হয়, দেখে আমার খারাপ লাগে।' না, তাপসী তাঁর খারাপ লাগাকে অভিযোগ বলতে চাননি। এটা তার ব্যক্তিগত অনুভূতি। তাঁর মতে, মুসলমানরা যে এদেশে নানা অসুবিধের সম্মুখীন হন, তার জন্য সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারণ সাধারণ মানুষই (পড়ুন হিন্দু এবং অন্যান্য অ-মুসলমান) মুসলমানদের প্রতি বিরূপ। এই বিরূপতাই বেরিয়ে আসে মুসলমানদের প্রতি তাদের ব্যবহারে। তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু সংগঠন যে মুসলমানদের প্রতি এই অমানবিক আচরণের মনোভাবটিকে উস্কে দেন সে ব্যাপারে তাপসীর কোনও সন্দেহ নেই।

বলা বাহুল্য, তাপসীর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন অসংখ্য মানুষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন তাপসী এরকম মন্তব্য করলেন? তিনি কি সত্যিই মনে করেন ভারতে মুসলমানদের প্রতি অমানবিক আচরণ করা হয়? নাকি এই মন্তব্য নেহাতই নতুন ছবির বিপণনের খাতিরে? ঠিক যেরকম তাঁর সমসাময়িক এবং অগ্রজ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা করে থাকেন।

তাপসী দক্ষিণী তারকা। বলিউডে পা রেখেছেন বেশিদিন হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এরই মধ্যে তিনি বলিউডের কায়দাকানুন বেশ রপ্ত করে নিয়েছেন। বলিউডের স্টাইল হলো ছবি রিলিজের আগে বিতর্ক তৈরি করা। সলমান খান নিজের ছবি রিলিজের আগে কোনও না কোনও ভাবে বিতর্ক তৈরি করেন। পরে তার বাবা সেলিম খান ক্ষমা চেয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। শাহরুখ খানের পছন্দ মুসলমানদের নিয়ে বিতর্ক। আমির খানও একটি ছবি রিলিজের আগে মন্তব্য করেছিলেন, 'আমার স্ত্রী এদেশে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন।' পরে এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কের ঝড় বয়ে যাওয়ায় বলতে বাধ্য হন, 'আমি ঠিক এভাবে বলতে চাইনি।' ততদিনে অবশ্য বিতর্কের জেরে আসমুদ্রহিমাচল তার ছবির নাম জেনে গেছে। এবং ছবিটির আকাশচুম্বী সাফল্যের পিছনে অন্যতম কারণ যে ওই বিতর্ক সে কথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া, করণ জোহরের পাক অভিনেতা ফাওয়াদ খানের পাশে দাঁড়ানো নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি। পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা সেনাছাউনিতে ঢুকে ঘুমন্ত ভারতীয় সেনাদের হত্যা করার পর, সারা দেশ চেয়েছিল, বলিউড পাকিস্তানের অভিনেতা গায়ক শিল্পীদের কাজ দেওয়া বন্ধ করুক। ফাওয়াদ খান তখন করণের একটি ছবিতে অভিনয় করার জন্য সবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। করণ ফাওয়াদ খানের হয়ে সাফাই গেয়ে বলেছিলেন, তিনি পাক অভিনেতার পাশেই আছেন। সেদিন তিনি দেশের আবেগকে গুরত্ব দেবার কথা ভাবেননি। পরে অবশ্য চাপে পড়ে মন্তব্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এবং শুধু তাই নয়, বলিউডের কোনও পরিচালকই ফাওয়াদ খানকে সাইন করাননি।

কিন্তু এই প্রবণতা কেন? ছবির ব্যবসার সঙ্গে যারা যুক্ত তারা বলেন, অভিনয় প্রতিভার জোরে ছবি হিট করানোর মতো অভিনেতা অভিনেত্রী প্রায় অবলুপ্ত হওয়ায় দেশে হিন্দি ছবির বাজার ভেঙে পড়েছে বললেই চলে। ফলে প্রযোজক পরিচালকদের এখন তাকিয়ে থাকতে হয় ভারতের বাইরেরর বাজারের দিকে। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা দেশের টানে এখনও হিন্দি ছবি দেখেন। পাকিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যেও হিন্দি ছবির বাজার ক্রমশ বাড়ছে। সেখানকার দর্শকদের জন্যই (মূলত মুসলমান) মুসলমানদের তোয়াজ করে চলতে হয়। একই দৃশ্য আমরা অহরহ দেখি কলকাতাতেও। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ধর্মনিরপেক্ষ কারণ বাংলাদেশের বাজার। কলকাতার বাজার যত সংকুচিত হচ্ছে ততই বাড়ছে বাংলাদেশের গুরুত্ব। এবং সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মুসলমানদের শাঁসেজলে রাখার চেষ্টা।

আসলে দুধেভাতে থাকার জন্যই সব। বাকিটা স্রেফ ভাঁওতা। ■

কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী : সম্বিত পাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ। সম্প্রতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তকে এভাবেই ব্যাখ্যা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তকে সম্বিতবাবু একই সঙ্গে হাস্যকর এবং আত্মঘাতী বোমা বলেও

অভিহিত করেছেন। উল্লেখ্য, লোকসভায় আস্থা-ভোটে হারের পরদিনই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বৈঠকে বসেছিল। বৈঠকে উপস্থিত সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পরিষ্কার জানিয়ে দেন, রাহুল গান্ধীকেই বিরোধী জোটের নেতা হিসাবে তুলে ধরতে হবে। তবে, নিজেদের জয় সম্পর্কে খুব একটা আশাবাদী না হয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব নিয়েছে, যে রাজ্যে যে দল শক্তিশালী তাদের সঙ্গে কৌশলগত জোট করা হবে। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এই বৈঠকে বলেন, বিজেপিকে হারাতে যা করতে হয় তাই করব আমরা।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবকেই বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেসের ওই বৈঠকটি ছিল নন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। আর এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছেন একজন অকাজের সভাপতি। ওই সভায় একটি দু'লাইনের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। ওই প্রস্তাব হতাশাজনক। ওই প্রস্তাবে যা বলা হয়েছে তার মূল নির্যাস হলো, নিজেরা জিতব না। তবে, বিজেপিকেও জিততে দেব না।'

সম্বিত পাত্র আরও বলেন, 'কংগ্রেসের এই ধরনের সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতী বোমা বলা যায়। ওরা এখন বুঝেই গেছে যে জিততে পারবে না। ওদের একটিই উদ্দেশ্য, যে কোনও উপায়ে নরেন্দ্র মোদীকে আটকাও। নরেন্দ্র মোদীর সরকার যে উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে তাকে আটকাও।'

বিজেপির সংবাদ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অনিল বালুনিও কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করেছেন। কংগ্রেস সভাপতি লোকসভা কক্ষে জোর করে প্রধানমন্ত্রীকে আলিঙ্গন করতেই পারেন। কিন্তু আগামী লোকসভা নির্বাচনে দেশের মানুষ রাহুল গান্ধীকে বুকে টেনে নেবে না। বালুনি আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী লোকসভা নির্বাচনে ১৫০টা আসনে তারা প্রার্থী দেবে। আর রাহুল গান্ধী বলছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন। এসব না বলে বরং রাহুল ২০২৪ সালে আবার সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার জন্য তৈরি হতে থাকুন।'

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যতই রাহুল গান্ধীকে বিরোধী জোটের নেতা হিসাবে তুলে ধরতে বলুক না কেন, আদৌ অন্য বিরোধীরা তা মেনে নেবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে কংগ্রেস নেতাদের মনেই। কেননা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন, রাহুলকে এখনই জোটের নেতা হিসাবে মানতে তিনি রাজি নন। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশে যদি সমঝোতা করতে হয়, তাহলে মায়াবতীও নেতৃত্বের দাবি ছাড়বেন না--- একথা কংগ্রেস নেতৃত্বও জানেন। শরদ পাওয়ারও নেতৃত্বের আর এক দাবিদার। এই পরিস্থিতিতে আদৌ জোট শেষ পর্যন্ত হবে কিনা সেটাই সংশয়ের। এত কথা বলেও শেষ পর্যন্ত আস্থা জোটে যে বিজেপিকে খুব একটা অসুবিধায় ফেলা যায়নি— তা মানছেন কংগ্রেস নেতারা। এমতাবস্থায়, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে জোট গঠনের সম্ভাবনাকে কংগ্রেস নেতারাই উড়িয়ে দিচ্ছেন।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

গুজবে কান দিয়ে অযথা বিভ্রান্ত হবেন না : রাজনাথ সিংহ

নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এন আর সি) নিয়ে অযথা আতঙ্কিত বা বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, সমস্ত বৈধ ভারতীয় নাগরিকই তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট সময় পাবেন। কাজেই শুধু শুধু আতঙ্কিত হয়ে উঠবেন না। বা, আতঙ্ক ছড়াবেনও না। অসমে খসড়া নাগরিক পঞ্জি প্রকাশের সাতদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতিতে একথা বলেছেন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অসমে নাগরিক পঞ্জির কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই এই নাগরিক পঞ্জি নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে নানা কথাবার্তা বলা হচ্ছিল। নাগরিক পঞ্জির বিরুদ্ধে নানাধরনের প্রচারও চলছিল। কোনো কোনো মহল উত্তেজনা সৃষ্টি করতেও আসরে নেমেছিল। খসড়া নাগরিক পঞ্জির আনুষ্ঠানিক প্রকাশের আগে তাই রাজনাথ সিংহ বিবৃতি দিয়ে এই উত্তেজনা নিরসন করার চেষ্টা করেছেন। রাজনাথ বলেছেন, ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট যে অসম চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলী মেনে নাগরিক পঞ্জির কাজ করা হচ্ছে। আমরা সবাইকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, প্রত্যেকের প্রতিই ন্যায়বিচার করা হবে। প্রত্যেকের প্রতি মানবিক আচরণও করা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নাগরিক পঞ্জিকরণের পুরো কাজটাই হচ্ছে স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং নিরপেক্ষভাবে। এই কাজ করতে গিয়ে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপরই নজর রাখা হচ্ছে। প্রতিটা ধাপেই প্রতিটি মানুষকে তার বক্তব্য পেশের সুযোগ দেওয়া হবে। এমনকী, আইনি পথেও যে সুবিধা পাওয়া যায়, প্রত্যেকের জন্য সেই ব্যবস্থাও রাখা হবে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, ৩০ জুলাই যে নাগরিক পঞ্জি প্রকাশ করা হবে, সেটি চূড়ান্ত নাগরিক পঞ্জি নয়। এটি একটি খসড়া মাত্র। কাজেই এটি প্রকাশ হওয়ার পর এ সম্পর্কে কারো যদি কোনো অভিযোগ থাকে, বা কেউ যদি নাম ঢোকাতে চান— তার জন্য অনেকটাই সময় পাওয়া যাবে। নানাবিধ সংশোধনের পরই চূড়ান্ত নাগরিক পঞ্জি প্রকাশ করা হবে। কাজেই এখনই কোনোরকম প্রচারে কান দিয়ে উত্তেজিত বা আতঙ্কিত হয়ে না পড়তেও অনুরোধ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রাজনাথ সিংহ বলেন, নাগরিকত্ব আইনে প্রত্যেককে ফরেনারস ট্রাইবুনালে অভিযোগ এবং আপত্তি দাখিল করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই নাগরিক পঞ্জি প্রকাশ হওয়ার পরই কাউকে কাউকে ডিটেনশন সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে যে প্রচার হচ্ছে— তা ঠিক নয়। এসব প্রচারে কান দিয়ে অযথা বিভ্রান্ত হবেন না।

খসড়া নাগরিক পঞ্জি প্রকাশের পর যাতে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয়--- অসম সরকারকে সেদিকেও নজর রাখতে হচ্ছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান। এই ব্যাপারে কেন্দ্র সরকার অসম সরকারকে সবরকম সহায়তা করবে বলেও জানান রাজনাথ সিংহ। উল্লেখ করা দরকার, অসমে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর লক্ষ্যেই নাগরিক পঞ্জির কাজ শুরু হয়েছে। অসম হচ্ছে একমাত্র রাজ্য যেখানে ১৯৫১ সালে নাগরিক পঞ্জিকরণ হয়েছিল। বর্তমান যে নাগরিক পঞ্জিকরণের কাজ চলছে তা শুরু হয়েছিল ২০০৫ সালে। তখন অসমে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় ছিল। তবে, বিজেপি অসমে ক্ষমতায় আসার পর নাগরিক পঞ্জিকরণের কাজে গতি আসে। ১৯৫১ সালে যখন অসমে প্রথম নাগরিক পঞ্জিকরণ হয়, তখন সেখানকার জনসংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষ। তখন থেকেই অসমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৭৯ সালে অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আসু) প্রফুল্ল মহন্তর নেতৃত্বে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করে তাদের ফেরত পাঠানোর দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ছ' বছর এই আন্দোলন চলার পর রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট অসম চুক্তি সই হয়। কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নিয়ে বিতর্ক তারপরও মেটেনি অসমে। এখন আবার নাগরিক পঞ্জিকরণকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক আবার তীব্র হয়ে উঠেছে অসমে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সরকারি তথ্য

মাও-দমনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য মোদী সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মাও-দমনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দাবিদার হলো নরেন্দ্র মোদীর সরকার। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রকাশিত এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান সরকারের আমলে ক্রমশ কমেছে মাও-হামলার ঘটনা, অন্যদিকে বেড়েছে মাওবাদী নিধনের সংখ্যা। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ২০১৪-য় ক্ষমতায় আসার পরই মাওবাদী দমনে যে কড়া মনোভাব নেয় কেন্দ্র, বর্তমানে তারই ফল পাওয়া যাচ্ছে। কোণঠাসা হয়ে পড়ায় ২০১৬ সালে মাওবাদী আত্মসমর্পণের হারও অনেকটা বেড়েছিল। পাশাপাশি স্বস্তিদায়ক ঘটনা হলো, নিরাপত্তারক্ষী ও সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে মাও-হামলায় নিহতের সংখ্যা অনেকটাই কমে যাওয়া।

গত ১৯ জুলাই ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে পুলিশি এনকাউন্টারে চার মহিলা-সহ আট মাওবাদীর মৃত্যু হয়। এই বছরের গোড়ায় ওই জেলাতেই দু'টি পৃথক এনকাউন্টারে ১৮ জন মাওবাদী মারা যায়। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলিতে পুলিশি অপারেশনে অন্ততপক্ষে ৩৯ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। উগ্রপন্থাকে ভারতের বুক থেকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিতে গেলে মাও-নিকেশ অবশ্যম্ভাবী এবং কেন্দ্র এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে এ বিষয়ে কোনও শৈথিল্য দেখাতে চায় না বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। পাশাপাশি তাঁরা মাও-কবলিত রাজ্যগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে, ছত্তিশগড় বা মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্য যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে, সেখানে মাও-দমনে কেন্দ্রের মতোই কঠোর হতে পেরেছে রাজ্য-প্রশাসন। কিন্তু সমস্যা দেখা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মতো অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মাওবাদী কবলিত এলাকায়, যেখানে মাওবাদীদের দমনে প্রশাসন এখনও সক্রিয় নয়। ভারত থেকে মাওবাদী নির্মূল করতে এটাই সবচেয়ে সমস্যার বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

গণধর্ষণে অভিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকর্মীরা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ঝাড়খন্ডের খুন্তি জেলার অন্তর্গত কোচাভ গ্রামে গত মাসে একাধিক মহিলার ওপর গণধর্ষণ চালানোর দায়ে এই নিয়ে ৫ জন ধরা পড়ল। দক্ষিণ ছোটনাগপুর জেলার আইজি নবীন সিংহ জানিয়েছেন, গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে নারী পাচার ও অসাধু নারী ব্যবসা চালানো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মহিলারা নাচ গান, পথ নাটিকা প্রদর্শন করছিলেন।

খুন্তি অঞ্চলে 'পাতালগড় আন্দোলন' পরিচালনা করার কাজে লিপ্ত তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দুই পাণ্ডা বলরাম সমাদ ও জন জোনাস টিরু ঘটনাস্থলে ছিল। ওই দু'জন পিপলস লিবারেশন ফ্রন্টের জুনাম কুণ্ডু, বাজি সামাজ ও অন্যান্য আরও কয়েকজন দুষ্কৃতীকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জানায়, মহিলারা ছদ্মবেশী পুলিশের ইনফরমার। এর পরই আরও দুই দুষ্কৃতী তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিরপরাধ মহিলাদের জোর করে অজ্ঞাত পরিচয় স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। বলা বাহুল্য, উল্লেখিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দুই পাণ্ডাও গণধর্ষণে অংশ নিয়ে মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। পুলিশ সূত্র অনুযায়ী গ্রেপ্তার এড়াতে ওই দু'জন চক্রধরপুর হয়ে মহারাষ্ট্রে পালাবার মতলব এঁটেছিল। ঝাড়খন্ড পুলিশের তৎপরতায় বলরাম মুরহু থানার অধীন এন এইচ ৭৫-এর জীবনটোলা অঞ্চল ও জোনাস পটকা থানার অন্তর্গত সিংভূম জেলার হাটচক থেকে ধরা পড়ে। এন জি ও'র কাজ বন্ধ করে দু'জনেই এখন হাজতবাস করছে বলে খবর।

রাখি ও স্যানিটারি ন্যাপকিন-সহ বেশ কিছু পণ্যকে জিএসটির আওতার বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নিল জিএসটি পরিষদ

কেন্দ্রীয় রেল, কয়লা, অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের নেতৃত্বে শনিবার (২১ জুলাই, ২০১৮) নতুন দিল্লিতে জিএসটি পরিষদের এক বৈঠকে বেশ কিছু পণ্যের ওপর পণ্য ও পরিষেবা করের মাত্রা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। করের হার ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে রং ও বার্নিশ; পুটিং, রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, ওয়াটার কুলার, মিল্ক কুলার, আইসক্রিম কুলার, ওয়াশিং মেশিন, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, মিক্সার অ্যান্ড গ্রাইন্ডার, ভেজিটেবল জুস এক্সট্র্যাক্টর, হেয়ার ক্লিপার্স, শেভার, ওয়াটার হিটার; ইমারসন হিটার; হেয়ার ড্রায়ার; হ্যান্ড ড্রায়ার; ইলেট্রিক আয়রন ৬৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত আয়তনের টেলিভিশন ইত্যাদি। এছাড়াও, বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক কিছু কিছু মোটরগাড়ির ওপরও করের হার ২৮ থেকে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে।

অন্যদিকে, জিএসটি-র হার ২৮ থেকে ১২ শতাংশ করা হয়েছে ফুয়েল সেল গাড়ির ক্ষেত্রে। কোনও কোনও পণ্যের ক্ষেত্রে জিএসটি-র হার ১৮, ১২ ও ৫ শতাংশ থেকে শূন্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। এই ধরণের পণ্যের মধ্যে রয়েছে-স্টোন, মার্বেল, রাখি, স্যানিটারি ন্যাপকিন, কয়্যার পিট কম্পোস্ট, ফুলঝাড়ু ইত্যাদি।

জিএসটি-র হার ১২ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে— হ্যান্ডলুম দড়ি, সার হিসেবে ব্যবহার্য ফসফরিক অ্যাসিড ইত্যাদি পণ্যের ওপর। আবার, করের হার ১৮ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে বাম্বু ফ্লোরিং, পেতলের তৈরি কেরোসিন প্রেসার স্টোভ, হস্তচালিত রাবার রোলার, জিপ ও স্লাইড ফাস্টনার্স ইত্যাদি।

যে সমস্ত পণ্যের ওপর জিএসটি-র হার ১৮ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে— তেল সংস্থাগুলির কাছে বিক্রির জন্য ইথানল, কঠিন জৈব জ্বালানির পেলেট ইত্যাদি। খুচরো বাজারে যে সমস্ত জুতো জোড়ার দাম ১ হাজার টাকা পর্যন্ত, সেক্ষেত্রেও জিএসটি-র হাস ৫ শতাংশ রাখা হয়েছে। তবে, ১ হাজার টাকার বেশি দামের জুতোর ক্ষেত্রে জিএসটি-র হার দাঁড়াবে ১৮ শতাংশ।

পার্স, হ্যান্ডব্যাগ, জুয়েলারি বক্স, ফটোগ্রাফ, আয়না ও ছবি আঁকার কাঠের ফ্রেম, শোলাপিট-সহ কর্কের তৈরি কারুকর্ম, কারুকার্য খচিত ফ্রেমযুক্ত আয়না, কাঁচের তৈরি মূর্তি, অ্যালুমিনিয়ামের ওপর শিল্পকার্য, পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদির ওপর জিএসটি-র হার ১৮ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ধার্য হয়েছে ১২ শতাংশ।

পণ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত জিএসটি-র হারকে বাস্তবসম্মত করে তোলার সিদ্ধান্ত নিল জিএসটি পরিষদ

কেন্দ্রীয় রেল, কয়লা, অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের নেতৃত্বে শনিবার (২১ জুলাই, ২০১৮) নতুন দিল্লিতে জিএসটি পরিষদের ২৮তম বৈঠকে জিএসটি-র হারে ছাড় ও পরিবর্তন সম্পর্কিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শনিবারের বৈঠকে। তথ্যপ্রযুক্তি ও ব্যাঙ্ক পরিষেবার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু ছাড় ও রেহাইয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রপ্তানি এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কাজকর্মের ক্ষেত্রেও ছাড়ের মাত্রা কিছুটা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই বৈঠকে।

সবুজায়নের একটি হিসাবে বৈদ্যুতিন গ্রন্থ সরবরাহের ওপর জিএসটি-র হারকে ১৮ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

স্থির হয়েছে যে, জিএসটি পরিষদের এই সুপারিশ ও সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর হবে ২৭ জুলাই, ২০১৮ থেকে। এ সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

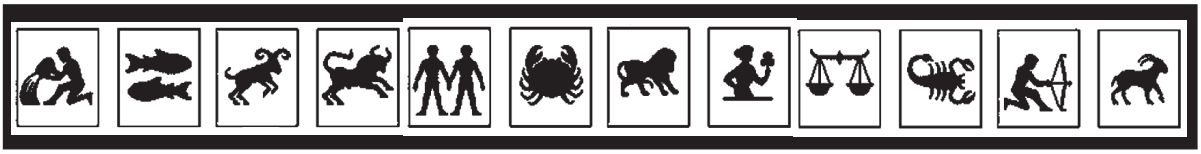

৩০ জুলাই (সোমবার) থেকে ৫ আগস্ট (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রবি-বক্রী বুধ-রাহু। সিংহে শুক্র, তুলায় বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে মঙ্গল-কেতু। বৃহস্পতিবার রাত্রি ১-২০ মিনিটে শুক্রের কন্যায় প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কুম্ভে ধনিষ্ঠা থেকে মেষে ভরণী নক্ষত্রে।

মেষ : দীপ্তিমান-ব্যক্তিপূর্ণ মধুর স্বজন সম্পর্ক, গুরুজনের আশীর্বাদলাভ, প্রভূত্বপদে প্রতিষ্ঠিত। প্রমোটিং, ব্রোকারি, দালালি, অংশীদারি ব্যবসায় ইতিবাচক ফল। শিল্পী, কলাকুশলীদের সৃষ্টির আনন্দে সপ্রতিভতা। রমণীদের প্রতি দুর্বলতা, অবিবাহিতের বিবাহ যোগ। চোখ ও হার্টের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন।

বৃষ : বহুদিনের সফল মনস্কাম, বিবাদ-বিতর্ক ও দুর্জন প্রতিবেশী এড়িয়ে চলা বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রযুক্তিবিদের সৃষ্টিশীল কর্মে বৈচিত্র্য, বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব। পরিণয়ে প্রেমের পূর্ণতা প্রাপ্তি, অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তায় দয়ার্দ্রহৃদয় ও মানবিকতার প্রকাশ। মিত্র শত্রুতে পরিণত হবে।

মিথুন : শরীরের যত্নের প্রয়োজন। মন-মানসিকতা, ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব ও গুণীজন সান্নিধ্য। নতুন কর্মসংস্থানের যোগ। সন্তানের মানসিক অস্থিরতা ও সময়ের অপচয়। মূত্রাশয় ও লিভারের চিকিৎসা প্রয়োজন।

কর্কট : শত্রুঘন-বন্ধুপ্রিয়-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, প্রিয়জনের বিবাহ, প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবহারজীবীর কর্মের প্রসারে দেবীর কৃপালাভ। ভ্রাতা- ভগ্নীর সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি বিষয়ক ফলপ্রসূ আলোচনা। ফ্যাশনেবল ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি। সপ্তাহের প্রান্তভাগে সপরিবারে ভ্রমণ ও জীবিকার নতুন দিশার সন্ধান।

সিংহ : অস্থির চিত্ত, অপরিকল্পিত ব্যয়, আলস্য, একাকীত্ববোধ অর্থাৎ হতাশার মহাসমুদ্রে নিমজ্জমান। ট্রান্সপোর্ট, ইলেকট্রনিক্স কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবসায়, নতুন উদ্যোগে সফলতা। সপ্তাহের মধ্যভাগে লাইফ পার্টনারের কর্মসংস্থানের যোগ, সন্তানের উচ্চশিক্ষায় প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বাসপথে ভ্রমণ পরিহার করুন।

কন্যা : চিন্তার দোদুল্যমানতায় ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজন ও দেব-দ্বিজেভক্তি, উন্নত সংস্কৃতি ও স্নেহপ্রবণ মন, আত্মীয়তা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি। নির্দিষ্ট পেশা ব্যতীত বিকল্প পথের সন্ধান। নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত ও স্নায়ুপীড়ার সম্ভাবনা।

তুলা : সুচিন্তা-সুস্থমন, গৃহ সংস্কার অথবা গৃহ নির্মাণ যোগ। কর্মে অতিরিক্ত দায়িত্ব বৃদ্ধি, যশ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্তি যোগ। বিজ্ঞানী, গবেষক, শল্যচিকিৎসকের উদ্ভাবনী প্রতিভার স্বীকৃতি ও মান্যতা প্রাপ্তি। স্বীয় ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতায় শত্রুতার প্রশমন। ক্রয়-বিক্রয় ও লিখিত চুক্তিতে সতর্কতা থাকা দরকার।

বৃশ্চিক : স্বজন বান্ধব, প্রতিবেশী ও গৃহের পরিবেশ সুখকর নয়। কর্মক্ষেত্রে অধস্তনের বিসদৃশ আচরণে মর্মপীড়া, কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা। সন্তানের কর্ম দক্ষতায় সম্ভ্রম ও সমৃদ্ধি। সপ্তাহের শেষাংশে সুহৃদদের সাহায্য লাভ।

ধনু : উর্ব্বর চিন্তা-মেধার বিকাশ, অনুভবী, উদারতা, সুন্দরের পূজারী, কর্তব্যপরায়ণ। মানী-জ্ঞানী, প্রিয়জন-সহ সুখীজীবন। চাকরীজীবীর অতিরিক্ত প্রাপ্তিযোগ। স্ব-পরিবার বিদেশ যাত্রার লোভনীয় হাতছানি। নবনির্মাণ ও বাহন ক্রয়ে গুরুজনের সহযোগিতা। বয়স্ক মিত্র হিতকারী নয়।

মকর : বিদ্যার্থীর জ্ঞান আহরণ ও ভ্রাতা-ভগ্নীর কর্মসংস্থানে অগ্রগতি। পিতার স্বাস্থ্যোন্নতি, সামাজিক দায়িত্ববোধে মানবিকতার প্রকাশ ও জনপ্রিয়তা। গৃহ ও বাহন যোগ। নিজ ব্যক্তিত্বে বিরোধিতা হ্রাস। খনিজ ও তরল উদ্যোগপতির শুভ। অপ্রত্যাশিত ভাবে গুণীজনের সান্নিধ্যলাভ।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে নিজ দক্ষতার স্বীকৃতি ও শংসাপ্রাপ্তি। চিত্রকর, অভিনেতা ও সংগীত পিপাসুদের স্বাচ্ছন্দ পদচারণা ও অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ, দুরূহকাজে কঠিন পরিচয়ে নতুন সুহৃদ সম্পর্ক। সন্তান ও ভাইয়ের জীবিকার নতুন সন্ধানে আনন্দ ও মানসিক প্রশান্তি। রমণীর কুহকে প্রতারণার সম্ভাবনা।

মীন : পুলিশ, সেনাধ্যক্ষ, খেলোয়াড়, কুস্তিগীর, ম্যাজিশিয়ানের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উপার্জনের বহুবিধ পথের সন্ধান। স্বাস্থ্য ও সমালোচনা মানসিক অস্থিরতার কারণ। মামলা-মোকদ্দমায় অনুকল ফল প্রাপ্তি। বিভাগীয় পরীক্ষা ও ইন্টারভিউতে অনায়াস সাফল্য।

• *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

শ্রী আচার্য্য